– চতুর্থ অধ্যায় –

রাজনৈতিক সময়ের আখ্যান

বিশেষ পাঠ ঃ ‘ছায়ার পাখি’, ‘অন্ধকারের নদী’, ‘আঁধার মহিষ’

চতুর্থ অধ্যায়
রাজনৈতিক সময়ের আখ্যান
বিশেষ পাঠ ঃ 'ছায়ার পাখি', 'অন্ধকারের নদী', 'আঁধার মহিষ'

'রাজনৈতিক সময়' বলে পৃথক কোন সময় বা কাল হতে পারে না, প্রতিটি সময়ই স্বভাবে রাজনৈতিক। সময়ের প্রতিটি তন্তুতেই রাজনীতির রং মিলে মিশে আছে। আর সাহিত্য যেহেতু সময়েরই শৈল্পিক রূপায়ণ, তাই তাতেও রাজনীতির সেই রং-এর আভা ছড়িয়ে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আধুনিক কথাসাহিত্যে রাজনীতির একটা বিশেষ পরিসর রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র পরবর্তী বিভিন্ন লেখকেরা নিজেদের সাহিত্যকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত রেখেছেন, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই হোক, আর অবচেতনেই হোক। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশে কৃষক' এর মতো প্রবন্ধ লেখার পরেও বলেছেন যে তিনি ইংরেজ বিদ্বেষক নন, ইংরেজদের অমঙ্গল আকাঙ্খা এবং দেশের অমঙ্গল আকাঙ্খা প্রায় এক। আসলে ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক ব্রিটিশ রাজকর্মচারী হিসেবে যে মত, যে রাজনৈতিক ধ্যানধারণা– বঙ্কিম নিজেকে কোনভাবেই তা থেকে মুক্ত করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথেও সমকালীন রাজনীতির ছাপ স্পষ্ট। এখানে উল্লেখ্য যে, রাজনীতি বলতে যে শুধু কিছু রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি, পরিকল্পনা রূপায়ণ, সংগ্রাম, মিটিং, মিছিল বা ভোটযুদ্ধ– এমন নয়। বরং প্রকৃত অর্থে রাজনীতি এর চেয়ে অনেক বড় পরিসর নিয়ে আমাদের সমাজে ব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'য় গোরার চরঘোষপুর যাওয়ার অভিজ্ঞতা আসলে একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক প্রেক্ষিতেরই প্রকাশ। গোরার জাতীয়তাবাদের মধ্যে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী ধরন– এই ধরন থেকে প্রকৃত ভারতীয় জাতীয়তাবাদে উত্তরণ– এই যে চিন্তাচেতনার রূপান্তর, মতাদর্শের বদল– এও একধরনের রাজনৈতিক প্রতিবেদন। এছাড়াও 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়' ইত্যাদিতে

সরাসরি রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহও উপন্যাসের বিষয় হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের পরে শরৎচন্দ্র 'পথের দাবী'র মত উপন্যাস লিখেছেন, যেখানেও রাজনীতির একটি বিশেষ ছাপ লক্ষণীয়। আসলে সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ, উপন্যাসে তাকেই নানাভাবে ধরবার চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তিমানুষটির অস্তিত্বের মূল্য দেশ-কালের স্থানাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত। দেশ-কাল হলো সাধারণভাবে উপন্যাসের পটপ্রেক্ষিত বা ফ্রেম। এই ফ্রেমের কোনো এক কিংবা অগণিত বিন্দুকে ছুঁয়ে থাকে জীবন, যে জীবনকে নানাভাবে দেখতে চায় উপন্যাস। দেশকালীন বাস্তবতায় যেমন আছে সমাজ, তেমনি আছে রাজনীতিও। তবু কোনো উপন্যাসকে যখন আলাদাভাবে 'রাজনৈতিক উপন্যাস' অভিধায় চিহ্নিত করি, তখন অবশ্যই এই ধরনের রচনায় কতগুলি অনন্য গোত্রলক্ষণ থাকে। রাজনৈতিক উপন্যাসের লক্ষণ আলোচনা করতে গিয়ে ইরভিং হো বলেছেন –

"A novel in which political ideas play a dominant role or in which political miliew is the dominant setting." [১] অর্থাৎ রাজনৈতিক মতবাদ কিংবা ফলিত রাজনীতির বিভিন্ন ঘটনা যখন উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ এবং মানবিক সম্পর্কগুলির অভিমুখ নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত করে, তখনই তা রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে গৃহীত হয়। অন্যভাবে বলা যায় কয়েকটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ থাকলেই হবে না, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার বিশ্লেষণ, রাষ্ট্র ও পৌরসমাজের সংঘাত সংঘর্ষ, ব্যক্তি ও রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বিরালাপের দর্পণে শোষক-শোষিতের সম্পর্কের সমালোচনা থাকতে হবে সেখানে। তবে 'রাজনৈতিক উপন্যাস' লিখব– এমন মানসিকতা নিয়ে কয়জন লেখক কথাসাহিত্য রচনায় হাত দেন, এতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কেননা রাজনৈতিক documentary র চেয়ে শিল্পিত কথাসাহিত্য রচনায়ই লেখকদের অধিক ঝোঁক থাকে, থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তব জীবনের প্রকৃত বাস্তবিক চলচ্ছবি রচনার বিষয় করে তুলতে হলে তো রাজনীতি উপাদান হিসেবে আসবেই। যেমন হয়েছে মানিক বন্দোপাধ্যায় এর 'চিহ্ন', 'স্বাধীনতার

স্বাদ', 'দর্পণ', 'শহরতলী' ইত্যাদি রচনায়। এই সমস্ত উপন্যাসেই রাজনীতি, লেখকের রাজনৈতিক ভাবনা, লেখক যে রাজনৈতিক সমাজ বা সংগঠনের সাথে নিজের ঐকান্তিকতা অনুভব করেন তার স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা গেছে। ১৯৪৪ সালে মানিক বন্দোপাধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির ফ্রন্টের কাজে সরাসরিভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে তার রচনাকে কেবল মাত্র শ্রেনিসংগ্রামের প্রচার মাত্র ভাবলে যথেষ্ট ভুল হবে। মানিক বন্দোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন–

"বস্তুবাদী লেখক অবশ্যই বাস্তবতার রিপোর্টার নন, তিনি শিল্পী। তিনিও কল্পনার রঙে রসেই তাঁর কাহিনী রূপায়িত করবেন, কিন্তু মিথ্যার সঙ্গে তাঁর কল্পনার কারবার থাকবে না। এই জন্যই তাঁর বাস্তব জীবনের গতিপ্রকৃতি ভালো করে জানা দরকার– তাঁর কল্পনা যাতে বাস্তবতাকে অতিক্রম করে ফাঁকা আদর্শবাদিতার মিথ্যায় পর্যবসিত না হয়, জীবনবিরোধী হয়ে না ওঠে।" [২]

লেখক আসলে বলতে চান যে কোন আধ্যাত্মবাদিতা বা ভাববাদিতার মোড়কে বাস্তবকে অতিরঞ্জিত করা উচিৎ নয়। মার্কসবাদী চিন্তপ্রস্থানের পিতৃব্য ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস্-এর মত অনুসারে,

"বাস্তববাদিতা, আমার মতে খুঁটিনাটি বর্ণনার সত্যতার বাইরেও গড়পড়তা পরিবেশে প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের বিশ্বস্ত উপস্থাপনাকে বোঝায়।" [৩]

মানিকও সম্ভবত 'বাস্তব'-এর এই রূপটিকেই যথার্থ বলে মনে করেন এবং সেইভাবেই স্থান দেন তাঁর রচনায়। আর এখান থেকেই লেখকের রাজনৈতিক অবস্থানটিও স্পষ্ট হয়ে যায়।

আসলে রাজনীতি হলো ক্ষমতার বণ্টন বা sharing । রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বিভিন্ন cross section of society বা ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক শ্রেনিভুক্ত জনগণের অংশিদারী কতটুকু থাকবে; নীতিপ্রণয়নে, নীতিবাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় কার কতটুকু অধিকার থাকবে,– এই বিষয়গুলিকে নিয়ে যে ভাবনাচিন্তা– সেই ভাবনাচিন্তাই হলো

রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তা। আর এই ভাবনাচিন্তার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ, রাজনৈতিক সংগঠন। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামিল হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ। জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে প্রান্তিক মানুষেরা সামিল হলেও, গরিষ্ঠ সংখ্যক জনগণকে কার্যত চেতনাহীন রাখারই যাবতীয় আয়োজন ছিল কংগ্রেসের কর্মসূচিতে। দেশকে ত্যাগের দ্বারা সেবার দ্বারা কর্মের দ্বারা অন্তরে অনুভব করবার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে নিছক চরকা কাটায় নিয়োজিত করে কর্তাভজার দলকে ভারী করে তোলার শর্টকার্ট পথের কঠোর সমালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' গ্রন্থের একাধিক প্রবন্ধে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক পরিসরে জন্ম নিয়েছিল নতুন দহনকথা। এমনই এক দহনকথার ঔপন্যাসিকরণ লক্ষ করি সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে। একই লেখকের 'জাগরী' তেও সমকালীন রাজনীতিই উপন্যাসের প্রধান আধেয় হয়ে উঠেছে। দেশভাগোত্তরকালের বাংলা কথা সাহিত্যে দেশভাগের সময়কার রাজনীতি এবং ব্যক্তি ও সমাজ মানসে তার প্রতিক্রিয়া নানাভাবে বিম্বিত হয়েছে। তবে এই সমস্ত রচনাই 'রাজনৈতিক' অভিধেয় হতে পারে না। মূলত রাজনৈতিক উপন্যাস বলতে সেই রচনাগুলিকেই ধরতে হয় যেখানে রাজনীতিই উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহের কেন্দ্রীয় শক্তি বা নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে।

এই আলোচনার সূত্র ধরে যদি স্বাধীনতা পরবর্তী কালের বাংলা আখ্যান সাহিত্যের দিকে দৃকপাত করি, তাহলে উপন্যাসের ইনার সারফেসে রাজনীতির অবিসম্বাদী ভূমিকা লক্ষ করি। মতাদর্শের পালাবদলের বহুচর্চিত দৃষ্টান্ত হল সমরেশ বসুর কথনবিশ্ব। 'নয়নপুরের মাটি' থেকে 'বি.টি. রোডের ধারে', 'শ্রীমতি কাকে' হয়ে 'গঙ্গা' পর্যন্ত জনতার সংঘবদ্ধতা ও সংগ্রামশীলতার যে আস্থা, তাই কিন্তু পরবর্তীতে প্রবল বিপরীতের আঘাতে নিরাকৃত। 'বিবর'-'প্রজাপতি'-'পাতক'-'স্বীকারোক্তি'তে সংঘচেতনাকে প্রত্যাখ্যানের রাজনীতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। 'শেকলছেঁড়া হাতের

খোঁজে,' 'মহাকালের রথের ঘোড়া' নামের উপন্যাসগুলিতেও রাজনীতি প্রধান অধেয়। বাম আন্দোলনের ভেতরকার সমস্যাগুলি অনাবৃত হয়েছে সেখানে।

ষাটের দশকের আখ্যানসাহিত্যে মধ্যবিত্ত জীবনের কাম-প্রেমের দ্বিরালাপই মুখ্য। কিন্তু রাজনৈতিক সময় তখন উত্তাল। ১৯৫৫ র খাদ্য আন্দোলন, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের আন্দোলন, পুর্নবাসন নিয়ে বিচিত্র রাজনীতি, তেভাগা, তেলেঙ্গানার পরবর্তী পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে পশ্চিবঙ্গে বামপন্থী কৃষক সভার আন্দোলন, বর্গাচাষির অধিকারের সংগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বিরোধী জোট গঠন, যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা, মোহভঙ্গ, নকশাল আন্দোলন, বাম শিবিরের বিভাজন - এই সব ঘটনা পশ্চিবঙ্গে যথার্থ অর্থেই রাজনীতি সচেতন সমাজ গড়ে তুলেছিল। সত্তর দশকের লেখাপত্রে এইসব ঘটনার অভিঘাত স্পষ্ট হয়ে উঠল। নানাবিধ ঘটনার মধ্যে দিয়ে, বিশেষ করে প্রান্তিক পরিসরের জনগণ যেমন শত্রু মিত্র চিনেছে, মধ্যশ্রেণির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তঃসারশূন্যতা ও বাহ্য আড়ম্বরের চরিত্রকে অনুধাবন করতে পেরেছে। সত্তর পরবর্তী যেসব লেখক পুঁজিশাসিত বিনোদন সাহিত্যের রচনার গড্ডলিকা প্রবাহের বাইরে এসে দেশকাল - রাজনীতির সামগ্রিক পটপ্রেক্ষিতকে কথাবয়নে হাজির করতে চেয়েছেন, অভিজিৎ সেন তাঁদেরই একজন। লেখক অভিজিৎ সেনের একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ রয়েছে। লেখক নিজেই স্বীকার করেন – *"আমার বাম-রাজনীতির সমর্থনের প্রকৃতি একেবারেই সাধারণ। সাধারণ মানুষের পক্ষে নানা 'বিভ্রমে- বিভঙ্গে' আক্রান্ত মতবাদ যুক্ত বামপন্থীদের উপরে আস্থা রাখার খুব একটা মানে সত্যিই নেই। এ শুধু যে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে সত্য তাই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এই মুহূর্তে ব্যাপারটা এরকমই। অন্যপন্থায় তো বটেই, বামপন্থার রাজনীতিবিদদেরও নানা কারণে সন্দেহ হয়। সরকারে যাওয়ার আগে তবু একরকম, সরকারে যাওয়ার পরে সমর্থন বহুসময়েতেই খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকার যেমন একটা সুবিধা আছে, আবার আরেক দিকে অসুবিধাও আছে। পার্টিজান নয় এমন*

একজন সমাজ ও রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি অবশ্যই কোনো না কোনো সময়ে নৈরাজ্যবাদী।

আমার কাছে খুব পরিষ্কার নয় কেন কম্যুনিস্টপার্টিগুলোর কাছে দাবি করা হয় যে তারা সংখ্যালঘু প্রধান অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থী দেবেন না। কেন শিল্পায়ন, নগরায়ন ইত্যাদি বৃহৎ কর্মকাণ্ডে বিদেশী পুঁজিপতিদের আহ্বান করবে না। কেন এ দেশে তারা পুঁজিবাদী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করবে না। এই রকম আরো অনেক প্রশ্ন।

অচিরেই বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্র এনে দেবার স্বপ্ন এখন আর এদেশে কেউ দেখায় না। সম্ভবত, নানা নীতি ও শৃঙ্খলায় বিভক্ত নকশালপন্থীরাও না। কোনো সাধারণ মানুষ এখন তা দেখেও না।

তবুও সারা দেশব্যাপী বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে বামপন্থীদের এখনো তুলনামূলকভাবে মহত্তর মানুষ বলে মনে হয়। মনে হয় আদর্শের ছিটেফোটা, সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকার মানসিকতা খানিকটা এখনো তাদেরই আছে।'' [৪]

অভিজিৎ সেন স্পষ্টতই একজন বামপন্থী লেখক। তার রাজনৈতিক মতাদর্শের মূল কথাই হলো আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই আধিপত্য গ্রামীণ, সহুরে বা যে কোনো অবস্থান বা পরিসরেই হোক না কেন। কংগ্রেস এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টি, ভারতের বাংলার বুর্জোয়া রাজনীতির এই দুটি প্রধান দলের কাজকর্ম সম্পর্কে একটা নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন লেখক অভিজিৎ সেন। তুলনামূলকভাবে বামপন্থার নীতি আদর্শ তাঁর কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। বামপন্থীদের মূল এজেন্ডাই হলো জনতার হাতে রাষ্ট্রক্ষমতার বণ্টন। কমিউনিস্টদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রধান বিষয় হচ্ছে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রাকশর্ত হিসেবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ হচ্ছে শ্রেনিহীন সমাজ গঠন এবং ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ। সমস্ত কিছুতেই থাকবে রাষ্ট্রের মালিকানা এবং রাষ্ট্র

প্রয়োজনসাপেক্ষে তা বণ্টন করবে। জমিচাষ, মৎস্যচাষ, ফল উৎপাদন এসবের জন্য রাষ্ট্রই চাষি, কর্মীদের চাষের জমি, মৎস্য চাষের জন্য পুকুর, ফলের জন্য বাগান ইত্যাদি লিজ দেবে। আবার উৎপাদনের শেষে সেই বস্তুকে বাজারজাত করার দায়িত্বও রাষ্ট্র নেবে। এটাই সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের এরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা রাশিয়াতে হয়েছে। পরবর্তীতে বিশ্বায়নের পরের পরিস্থিতিতে চীন ও ভিয়েতনামেও সমাজ তান্ত্রিক অর্থনীতি আর বাজার ব্যবস্থার মধ্যে একটা সংলাপ গড়ে তুলে অর্থনীতির একটা নতুন ধাঁচা গড়ে তোলার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো একটা বুর্জোয়া পটভূমিতে, যেখানে একটা ধনতান্ত্রিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে, সেখানে এরকম একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আনয়ন এবং পরিচালন একেবারে সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, কিন্তু সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের উন্নয়নের জন্য এই ব্যবস্থার আনয়নকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন Liberal Democratic অর্থাৎ উদারবাদী গণতান্ত্রিক মানুষেরা। সত্তরের দশকের বেশিরভাগ লেখকেরাই এই liberal democratic মনোভাবাপন্ন। তারা কিছুটা আপোস, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে সমর্থন করলেও মূল সুরটা তাদের বামপন্থী কেননা তারা সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন, মুক্তি, অংশগ্রহণ– এসবে বিশ্বাসী। অভিজিৎ সেন ও এদেরই একজন।

বামপন্থী লেখকের রচনার আলোচনার পূর্বে বামপন্থাকে একটু কাছ থেকে দেখে নেওয়ার দরকার আছে, জেনে নেওয়া দরকার আছে এর বিবর্তনের ইতিহাস। 'সত্তর দশক' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক অনিল আচার্য কমিউনিস্ট পার্টির বিবর্তনকে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের আকার দিয়েছেন, যেখানে তিনি লিখছেন–

"অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত সংঘর্ষের কারণে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নামে নিজেদের অভিহিত করে বিভক্ত হয়। নকশালবাড়ী আন্দোলনের ফলে এই নব্য গঠিত কমিউনিস্ট পার্টিও বিভক্ত হল। কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) নামে গঠিত হল নতুন আরেকটি দল।

সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে কেউ যদি কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস লিখতে বসেন, তাকে অবশ্যই সত্তর দশকের আন্দোলন সেই ইতিহাসে সশস্ত্র কৃষি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই বিভাজনের দুটি শব্দ বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজিত হবার সময় ব্র্যাকেটে (M) অর্থাৎ (Marxist) শব্দটি যোগ হল। এর অর্থ দাঁড়ায় আগের (CPI) দলটি মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। না হলে যৌক্তিকভাবে বিভাজন হয় না। সেইজন্য এই পুরোনো অংশকে আখ্যায়িত করা হল 'শোধনবাদী' এই শব্দের অভিঘাতে। ইতিহাস একইভাবে ফিরে এল এবারও। কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) থেকে বিভাজিত হয়ে নতুন দল করলেন তারা আরও একটি ইংরেজী অক্ষর (L) অর্থাৎ (Leninist) যোগ করে দিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি অব্ ইন্ডিয়া নামটি থেকে গেল, বদল হলো ব্র্যাকেটের অক্ষর যা নামের দ্বারা বিশেষিত। নতুন দলের নাম হলো কমিউনিস্ট পার্টি অব্ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট) অর্থাৎ CPI (M-L)। যাঁরা বিভাজিত হয়ে নতুন পার্টি বা দল বানালেন, কারণ হিসাবে তাঁরাও একটি যুগ্ম শব্দে বিশেষিত করলেন মূল অংশকে 'নয়া শোধনবাদী'।

আসলে নামে কী আর এল গেলো। 'শোধনবাদী' ও 'নয়া শোধনবাদী' নির্বাচন ও সংসদীয় ও সাংবিধানিক গণতন্ত্রের অংশ হয়ে গেলেন। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর তথাকথিত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য আর রইল কোথায়? এঁরা বললেন সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করে 'মানুষকে' বোঝাতে হবে এ পথে বিপ্লব হবে না। তবেই না 'মানুষ' জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়বে? তখন আর তেমন বৈরিতা রইল না। তৈরি হলো 'যুক্তফ্রন্ট' থেকে 'বামফ্রন্ট'। ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তাঁরা এস.ইউ.সি. ছাড়া অন্য দলগুলিকে নিয়ে সরকারে এলেন। বন্দীমুক্তি আন্দোলন সফল হলো সাময়িকভাবে। জেল থেকে ছাড়া পেলেন নকশাল আন্দোলনের কর্মী ও নেতারা। যেহেতু তখন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি অব্ ইন্ডিয়া (মার্কর্সবাদী–লেনিনবাদী) সংসদীয় গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী, তাই তারা রইল না এই

'বামফ্রন্টে'। তাদের একটি অংশ পরে সংসদীয় গণতন্ত্রে যোগদান করলেও ব্যাপক অংশটি সশস্ত্র সংগ্রামের পথ গ্রহণ করে নানা-নাম ও দল উপদলে বিভক্ত হবার পর একবিংশ শতকে তারা মাওয়িস্ট নামে আখ্যায়িত হচ্ছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলি তাঁদের 'সন্ত্রাসবাদী' বা 'টেররিস্ট' নামে আখ্যায়িত করছেন। সাময়িকভাবে অবদমিত হলেও এখন তারা ভারতের বেশ কয়েকটি প্রদেশে বিস্তৃত করেছেন তাঁদের সংগঠন। বিশেষ করে আদিবাসী অধ্যুষিত বনাঞ্চলে তাঁদের প্রভাব অনেক বেশী। তাই একবিংশ শতকে তাঁরা 'মাওবাদী' নামে অভিহিত হলেও এখনও তাঁদের 'নক্সালাইট' বা 'নকশালপন্থী' বলে বলা হয়। এখানেই বারে বারে ফিরে আসে সত্তর দশক। বিভাজনের ফলে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী একটি অংশ ও সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নিয়ে আজও ক্রিয়াশীল। তাই বার বার সত্তর দশকের নাম উঠে আসে ইতিহাসে।'' [৫]

এই সত্তরের দশকেরই একজন বামপন্থী মনভাবাপন্ন লেখক হলেন অভিজিৎ সেন যিনি কমিউনিস্ট পার্টির এই দীর্ঘ বিবর্তনের বহু শাখা প্রশাখায় জেরবার হয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসলেও বামপন্থার মূল আদর্শ থেকে কখনই নিজেকে বিচ্যুত করেন নি।

Social Democratic দের প্রবল বাড়াবাড়িই ১৯৬৪ সালে বামপন্থী রাজনীতিকে বিভক্ত করে। চীন-ভারত যুদ্ধের সময় গ্রেফতার হওয়া, শোষিত হওয়া ইত্যাদির দরুন দেখা যায় কমিউনিস্টদের মধ্যে একটা বড় অংশ কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে চলার কথা বলে। এখানে মূল লক্ষ্যের প্রশ্নে কোন বিরোধ নেই, কিন্তু রণকৌশলগত প্রশ্নে, রাজনৈতিক বাস্তবসম্মত কৌশলের প্রশ্নেই বিরোধ হয়। ব্যক্তিগত স্তরেও বিরোধ হয়। যার ফলে পার্টি ভাঙে। যার ফলে অনেক পার্টি সমর্থক রাই বিভ্রান্ত হয়। তারপর দেখা যায় ১৯৬৭ সালে প্রথমে যুক্তফ্রন্ট এবং ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সম্পূর্ণভাবে পাকাপাকি হয়। প্রথম যুক্তফ্রন্টের পতনের ফলে অজয় মুখার্জি মন্ত্রীত্ব পান, জ্যোতিবসু

হন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু এমত অবস্থায়ও দেখা যাচ্ছে সাধারণ এর মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন সঠিক অর্থে হচ্ছে না। অবলীলায় চলেছে কৃষকদের ওপর নানা দমন পীড়ন, জোতদারেরা নানা ছলনা করে বর্গাচাষিদের ঠকাচ্ছে, প্রতারিত করছে। নামে বেনামে, কাল্পনিক নামে, দেবোত্তর জমি ঘোষণা করে জমিদারেরা জমির অধিকার নিজেদের হাতে রাখতে চাইছে। যে জমিদারি উচ্ছেদ বামপন্থীদের প্রধান অহংকার সেই জমিদারি উচ্ছেদ-এর মধ্যে যে কত ফাঁকি, কত প্ররোচনা ধীরে ধীরে তা ধরা পড়তে শুরু করে। তাই এসব উঠে আসতে থাকে সাহিত্যের বয়ানে। ভগীরথ মিশ্রর 'মৃগয়া', 'তস্কর', দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'য় এই রাজনৈতিক লক্ষ উৎকীর্ণ। যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ক্ষমতা পাওয়ার একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল, কিন্তু তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। প্রাথমিক বিহ্বলতা কেটে গেলে চোখে পড়ল আসন বদল হলো বটে, তবে অবস্থানের পরিবর্তন তেমন হলো না। বিষয়টি আরও পরিস্কার হয় 'তস্কর' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বানেশ্বর ঘোষের স্বগত চিন্তায়–

"দেশ-মহারাজের বিচার সভায় বানেশ্বর ঘোষই মধ্যমণি। দলের থানা কমিটির সে প্রেসিডেন্টও বটে। বাপ দুয়ারী ঘোষ ছিল এ তল্লাটের ঝানু বিচারি। তার প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেতো।... তবে দেশ মহারাজের আসনে বসে জমিয়ে বিচার পঞ্চাৎ করার দিন ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। পরপর দুটো যুক্তফ্রন্টই দেশ গাঁয়ের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে। সেই যে হরেকিষ্টো কোঙার মেদুনপুর শহরে মিটিং করে সব্বাইকে লাঠি-সরকির ডগায় বেনাম জমিনের দখল নিতে বললো, দেশ গাঁয়ের অধঃপতন শুরু হলো তখন থেকেই। .... কম জ্বালিয়েছে সাতষট্টি থেকে একাত্তর? শালা, নিজের ঘরে চোরটি সেজে বসে থাকা.... আর বিচার আচার? ফি সন্ধ্যায় বিচার বসতো প্রদ্যোৎ ভঞ্জর উঠোনে..... রোজ সন্ধ্যায় ডাকা হতো এলাকার একজন কি দু'জন সম্ভ্রান্ত মানুষকে। নামেই বিচার। আসলে চলে মানী লোকের মান হরণের

ব্যবস্থা। সুদ খাটাও ক্যানে? বন্ধক রাখো ক্যানে? দেশের ধান চড়া দামে বাইরে বিক ক্যানে?..... আরে, দেশ গাঁয়ের চিরকালের ধারাই যে ঐ। তাই সুদ খাটাই, বন্ধক রাখি, ধান বিকি। মোর বাপ ঠাকুদ্দা চোদ্দ পুরুষ অনাদিকাল থেকে এসব করে আসছে। এটাই সমাজের রীতি। ..... ভাগ্যে বাহাত্তরে জিতলো দল, ভাগ্যে জরুরী অবস্থাটা আইল দেশে।..... জরুরী অবস্থা জারি হতেই, পুলিশ দু-চার বার ভিড়কা ভিড়কি করতেই যে যার মুষার মতন গর্তে সেঁধিয়ালঅ। প্রদ্যোৎ ভঞ্জ সক্কলের আগে।..... দেশে গাঁয়ে আবার ফিরে এলো সেই পুরনো দিন। সুদ বন্ধকী ফের শুরু হলো। ..... সাবেকী দিনের বিচার পঞ্চাত, দেশ সমাজ– আবার ঠাঁই নিলো গাঁ ঘরে।'' [৬]

ফলে দেখা যাচ্ছে, তেভাগা আন্দোলন, বর্গাব্যবস্থা, আধিরেকর্ড-এ সমস্তই যেন কাগজ– কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে যাচ্ছে একটা বিরাট অংশের ক্ষেত্রে। দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এ বাঘারু তাই আধি জমিতে নিজের নাম কাটিয়ে জমিদার গয়ানাথকে বহাল রাখতে ঘোষণা করছে –

"মোক ঐঠে পাঠায় গয়ানাথ জোতদার, হাল-বলদ-বিছন সগায় ওর। মুই হালুয়া আছিল কয়েক বছর। অ্যালায় আর নাই। মোর নামখান কাটি দাও। ঐ জমিখান লিখি দাও গয়ানাথ জোতদারের নামত্। লিখি দাও, শ্রী ফরেস্টারচন্দ্র বাঘারু বর্মনক এই জমিঠে উচ্ছেদ দেয়া গে-এ-এ-ই-ল্।'' [৭]

এরকম উদাহরণ আমরা অভিজিৎ সেনের 'বর্গক্ষেত্র' উপন্যাসেও পেয়েছি। সেটেলমেন্ট রেকর্ড এর সময় চাষিদের আধি থেকে উচ্ছেদ করার ঘটনা যে কীভাবে একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তা আমরা বুঝতে পেরেছি এই উপন্যাসগুলিতে। এই প্রক্রিয়াটাও এক ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, এদের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা একজন রাজনৈতিকভাবে দায়বদ্ধ মানুষ ছাড়া কখনই সম্ভব নয়।

সত্তরের দশকের 'গ্রামে চলো' স্লোগান তোলা লেখকদের রচনায় একটি

গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বারে বারেই হাজির হয়েছে পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত হলো একটা তৃণমূল স্তরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলো পঞ্চায়েতের দর্শন। একেবারে প্রান্তিক মানুষও যাতে রাষ্ট্রব্যবস্থার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে– তা-ই হলো পঞ্চায়েতের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু দেখা গেছে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে নতুন করে গ্রামের মধ্যে একটা ক্ষমতাবান শ্রেনি তৈরি হয়েছে। পঞ্চায়েত নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠছে। প্রতিষ্ঠান মানেই একধরণের মৌরসি। সে যে কোনো রাজনৈতিক দলের মৌরসি হতে পারে। আবার কখনও পরিবারতন্ত্রের, গোষ্ঠীর ক্ষমতার আধার হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষকে নিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য তৈরি হয়েও ধীরে ধীরে একটা সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়ে নিচ্ছে একটা পঞ্চায়েত। অভিজিৎ সেনের 'ছায়ার পাখি' উপন্যাসে এই বিষয়গুলির বাস্তবসম্মত রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসটি নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে লেখক নিজে এই উপন্যাসটি নিয়ে কী বলছেন তা একটু দেখে নেওয়া যাক–

"এই মুহূর্তে কোনটি আমার সেরা উপন্যাস, সে কথা বলা হয়তো আর সম্ভব নয়। কিন্তু 'ছায়ার পাখি' নিয়ে আমার আবেগ এখনো খুব বেশি। '৮৮-'৮৯ সালে এই উপন্যাস লিখি আমি। তপন ব্লকের সংস্পর্শ থেকে সে সময় বেশ খানিকটা দূরে সরে এসেছি। চাকরিসূত্রে দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি ব্লকের একটি শাখায় বদলি হয়ে এসেছি। হিলি শহরটি দুভাগে বিভক্ত। স্বাধীনতার আগে হিলি রেলষ্টেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দার্জিলিং মেল কিংবা কলকাতা থেকে আসাম যাওয়ার গাড়ি যেত এই ষ্টেশন দিয়ে। বালুরঘাট শহর থেকে ষোলো কিলোমিটর দূরে এই ছোটো রেল শহরটি দেশভাগের পরে দু–ভাগ হয়ে গেল। রেলষ্টশন রইল ওপারের দিনাজপুরে, বাজার রইল এপারে। মাঝখানে রেললাইন। সারাদিন শহরটা ঘুমন্ত, প্রায় প্রাণহীন অবস্থায় পড়ে থাকে। সন্ধ্যা হলেই প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠে এই শহর। এপার-ওপার একাকার হয়ে যায়। মেলামেশা ব্যবসা বাণিজ্য সবই চলে। সারারাত ধরে একটা কর্মব্যস্ততা।

এই শহর এবং সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষকে নিয়ে অনেক গল্প লিখেছি, লিখেছি 'ক্রান্তিবলয়', 'অন্ধকারের নদী' এবং 'ছায়ার পাখি' নামে তিনটি উপন্যাস। জমি উর্বর, মাটির নীচে প্রচুর জল, বৃষ্টিপাত ভালো। তপনের থেকে একেবারেই আলাদা। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত এই ব্লকের দুটি শাখায় কাজ করেছি আমি। এই সময় লেখা তিনটি উপন্যাসের মধ্যে 'ছায়ার পাখি' অবশ্যই সেরা।

'ছায়ার পাখি'-র নদীটির নাম চিরি। হিলি শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটির নাম যমুনা। ধল্লা আর আড়বেঁকি এই দুটি বিল স্বনামেই আছে। সত্তরের দশকের শেষদিকে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট একেবারে উল্টে যেতে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আসে মানুষের জীবনে তথা চেতনায়। সেই পরিবর্তনকে ভিত্তি করে আগে পরের সামাজিক পর্যালোচনা সহ একটা গল্প বলেছি আমি।'' [৮]

সত্তরের দশকের শেষদিকে পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট একেবারে উল্টে যেতে একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল মানুষের জীবনে এবং চেতনায় যার মধ্যে যুক্তফ্রন্টের ভাঙন, মতাদর্শের পার্থক্য, কেন্দ্রের রাজ্যের রাজনৈতিক দলের সাথে বিভিন্ন জেলাস্তরের রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মতবিরোধ, সংগ্রাম। যার বিচিত্র বহিঃপ্রকাশের মধ্যে খুন-হাঙ্গামা-শোষণ-প্রতারনা-বঞ্চনা-স্ত্রীজাতির উপর লাঞ্ছনা ইত্যাদির বাস্তব রূপায়ণ প্রক্রিয়ায় 'ছায়ার পাখি' যেন হয়ে উঠেছে একটা নির্দিষ্ট সময়ের রাজনীতির ঐতিহাসিক দলিল।

উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট হিসেবে লেখক পশ্চিমবাংলার একটি মফস্বল অঞ্চল জলছুই এবং এর পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামকে তুলে এনেছেন। এই নির্দিষ্ট অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থা এবং পরিস্থিতির বিবর্তন গোটা বাংলার রাজনৈতিক ওঠাপড়ায় আখ্যান। কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট– এই দুইটি রাজনৈতিক শিবিরের সঙ্গে যুক্ত কিছু মানুষকে উপন্যাসে তুলে আনা হয়েছে, আছেন কিছু সাধারণ, খেটে খাওয়া মানুষও যারা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথেই যুক্ত নন। কেননা তাদের জীবনে বেঁচে থাকার

সংগ্রামটাই এত কঠিন যে তাদের এসবে জড়ানোর অবসরটুকুও নেই।

উপন্যাসটির কাহিনি শুধু হয়েছে দুইটি খুন এবং একটি অন্তঃসত্তা বিধবা মেয়ের তার সন্তানের পিতার ঠিকানায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে জলছুই-এ আগমনের ঘটনা দিয়ে। খুন দুটির একটি হয়েছে কংগ্রেসের এক তরুণ উঠতি কার্যকর্তা বিমলের হাতে বামদলের একেবারে তৃণমূল স্তরের পিছিয়ে পড়া উপজাতির জনপ্রতিনিধি নরেন মালোর। এই বিমলই অন্তঃসত্তা রজেশ্বরীর সন্তানের পিতা।

গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কম্পাউন্ডার থেকে ডাক্তার হওয়া নিখিলেশ্বরের বখাটে নেশাগ্রস্ত, চরিত্রহীন ভাই সুরেশ্বরের ছেলে হলো বিমল। নিখিলেশ্বর এবং সুরেশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক যদিও একেবারেই মধুর নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমানে উভয়েই তারা কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। যদিও সুরেশ্বর ব্যক্তিগত স্বার্থে ইতিমধ্যেই দু-একবার অন্য দল গ্রহণ এবং বর্জনের কাজও করে নিয়েছে। এই সুরেশ্বরের পুত্র বিমল *"পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর সালে অবিসংবাদী তরুণ নেতা হয়ে যায় কংগ্রেসীদের''* [৯]

ফলে যে সুরেশ্বর এক সময় ছিল সকলের অবহেলার পাত্র, আজকে পুত্রের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাকেও ক্ষমতাশালী করে তুলে লোকেদের কাছে সম্মানীয় কয়ে তুলেছে। সুরেশ্বরের রাজনৈতিক জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে কীভাবে স্বার্থান্বেষী জনগণ রাজনীতিকে নিজেদের স্বার্থের জন্য খেলার পুতুল-এ পরিণত করে তুলেছে তার এক চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন লেখক অভিজিৎ সেন–

"তখনো অর্থাৎ ষাট-পয়ষট্টি, সালে। সেইসময়ে সুরেশ্বর খুব পার্টি করতে শুরু করে। তখন আশেপাশে বামপন্থীরা খুব সংগঠন জোরদার করতে শুরু করে। বস্তুত, পঁয়ষট্টি সালের পর থেকে তাদের সংগঠন বাড়তেও থাকে হু-হু করে। কিন্তু কংগ্রেসীরা খুব জোরদার ছিল এই থানায়। বামপন্থীদের এখানে মাথা তোলার ক্ষমতা তখনো হয়নি। নিখিলেশ্বর তখন ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি। প্রবল শক্তিশালী সংগঠন তখন

কংগ্রেসের ।

সেই স্থিতাবস্থায় ফাটল ধরিয়েছিল সুরেশ্বর। কংগ্রেসী নেতৃত্বের অবস্থাপন্নদের সাথে একাসনে বসবার ক্ষমতা সুরেশ্বরের ছিল না। উপরন্তু, ভাইয়ের সঙ্গে রেশারেশি তো প্রথম বয়স থেকেই। আর বাবা যতদিন বেঁচে ছিল, সেই রেশারেশিতে সে তো জিতেই এসেছে।

কিন্তু চৌষট্টিতে বাবা ছিল না। চৌষট্টিতে নিখিলেশ্বর জলছুইতে অবস্থাপন্ন শক্তিশালী গৃহস্থ। যে সুরেশ্বর তেষট্টিতে অর্জনপুরে সভা করতে আসা বামপন্থীদের মেরে তাড়িয়েছিল, চৌষট্টিতে সেই সুরেশ্বরই তাদের ডেকে নিয়ে আসে। বামপন্থীরা তখন তাকেই নেতা বানায়। তাদের সংগঠন খুব দ্রুত বাড়তেও থাকে।..... তখন সে এ অঞ্চলের লালঝাণ্ডার নেতা। তিনবছরের মধ্যে সমস্ত থানায় লালঝান্ডার সংগঠন ছড়িয়ে পরে। এ সবই সম্ভব হয়েছিল সুরেশ্বরের সহায়তায়। সুরেশ্বর সামনে থাকায় প্রতিপক্ষীয়রা বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়াতে সাহস করেনি। কিন্তু সাতষট্টিতে যখন সব ওলোট-পালোট হয় এবং বামপন্থীরা যুক্তফ্রন্ট করে ক্ষমতায় আসে তখন এ অঞ্চলে তাদের সবথেকে বড় নেতা হয়ে দাঁড়ায় পরমেশ্বর দাস নামে এক ব্যক্তি।..... কিন্তু এতেও দমেনি সুরেশ্বর। সে নতুন ক'রে বাংলা কংগ্রেসের সংগঠন করে। বাংলা কংগ্রেস ডুবলে সুরেশ্বর আর শত চেষ্টা করেও কংগ্রেসে ফিরে আসতে পারেনি। তখন থেকে, কি কংগ্রেসী, কি বামপন্থী, সবাই তার শত্রু হয়েছিল।

তারপর এক সময় সুরেশ্বর অবাক হ'য়ে লক্ষ্য করে বিমল অজান্তেই তার মাথায় মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে।..... পঁচাত্তর - ছিয়াত্তর সালে বিমল অবিসংবাদী তরুণ নেতা হ'য়ে যায় কংগ্রেসীদের। যে সব লোক একসময় সুরেশ্বরকে দূর-দূর ছেই-ছেই করত, তাদের অনেকেই এখন বিমলের করুণার উপর নির্ভর করতে শুরু করে। সুতরাং দরিদ্র এবং অর্কমণ্য সুরেশ্বর একধরনের আত্মপ্রসাদ লাভ করতে থাকে যা পুত্রগর্ব এবং প্রতিশোধের মিশ্ররূপ।'' [১০]

বিমলের মধ্য দিয়ে আধিপত্যের স্বাদ নিতে চাইছে সুরেশ্বর। কিন্তু একসময়ে বালক বিমলের জন্য অন্নসংস্থানের চিন্তাও করেনি পিতা সুরেশ্বর। কিন্তু আজ খুনের দায়ে জেলবন্দি বিমলকে জামিনে ছাড়ানোর জন্য টাকা চাইতে এসেছে ভাই নিখিলেশ্বরের কাছে। নিখিলেশ্বরও কংগ্রেস করে, কিন্তু সেও লক্ষ করছিল যে এক ধরনের পরিবর্তন ঘটছে পার্টির মধ্যে–

"কংগ্রেসীদের কাঠামো দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। নতুন ছেলেরা অনেক বেশি পেশাদারী। বয়সের ভারিক্কি চাল এবং ওজন তারা অনায়াসে এবং অবহেলায় অগ্রাহ্য করছে। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে বয়স্কদের অস্তিত্বই নির্ভর করতে শুরু করল নতুনদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর। জাতিশত্রুতা পরবর্তী প্রজন্মে পল্লবিত হয়, যখন নিখিলেশ্বর দেখে বিমল নজর করার মত নেতা হ'য়ে উঠেছে কংগ্রেসের।'' [১১]

এই নেতা বিমলই খুন করে আরেক জনপ্রতিনিধি নরেন মালোকে। নরেনের মধ্যে আরেক ধরনের রাজনৈতিক জননেতা, আরেকটি রাজনৈতিক দলের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন লেখক অভিজিৎ সেন। আড়বেঁকি মালোদের ছেলে নরেন আড়বেঁকি থেকে বাইরে বেরোনোর পথ আক্ষরিক অর্থে এবং বিশেষ অর্থেও তৈরি করে দিয়েছিল সাধারণ জনগণের জন্য। সে লেখাপড়া করেছিল, তারপর বামপন্থী সংগঠনের সাথে নিজেকে যুক্ত করেছিল।

"নরেন হয়েছিল পার্টির কর্মী, সর্বসময়ের কর্মী। একথা ঠিক ইস্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ করার পর নরেন জীবনের চরম আকাঙ্খিত যে সম্ভাবনাক লালন করত, তা হোল প্রাইমারি ইস্কুলের একটা মাস্টারি।'' [১২]

কিন্তু সেই আকাঙ্খা তার পূর্ণ হয় নি। কারণটাও সম্ভবত রাজনৈতিক –

"সম্ভবত, নরেনের সব থেকে বড় দোষ ছিল যে সে আড়বেঁকির মানুষ। আড়বেঁকির মানুষেরা লালঝাণ্ডার ভোটার বলে সে সময়ে চিহ্নিত হয়েছিল।'' [১৩]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, ব্যক্তির রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থনই তার জীবিকা

সংগ্রহে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চাকরি লাভের ক্ষেত্রে শৈক্ষিক যোগ্যতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ রূপে বিবেচিত হচ্ছে তার রাজনৈতিক অবস্থান কিন্তু যারা দলের আদর্শের চেয়ে আপন স্বার্থচিন্তা বেশি করছে, সেই সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গ বামপন্থী হয়েও ঠিক চাকরি জোগাড় করে নিচ্ছে। নরেনের ভাষায়–

"তবুও শহরের ক্ষমতাশালী কমরেডদের ভাইবোন, শালা-শালীদের যেভাবে অযাচিত চাকরি হয়ে যেত, সেসব দেখে মন ছোট হয়ে যেত বৈকি কখনো কখনো।" [১৪]

কিন্তু নরেন পথভ্রষ্ট হয়নি। আর তাই হয়তো এর মূল্য তাকে দিতে হয়েছে প্রাণ দিয়ে। কিন্তু তার এই আত্মদান খুব একটা কাজে লেগেছে বলে মনে হয় নি। কেননা অভিযুক্ত বিমল অতিসহজে জামিনে বেরিয়ে গেছে এবং আরও প্রবল শক্তিধর হয়ে উঠেছে। নরেনের হত্যা যেন বিমলকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে তার পার্টির কাছে। অন্যদিকে নরেনের বামদলও এ বিষয়ে খুব একটা সক্রিয় পদক্ষেপ নেয় নি। কেননা বামদল তখন নিজেদের মধ্যেকার অন্তর্কন্দলেই দিশাহারা যেন কিছুটা। নরেনের শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত হয়েও নরেনের মৃত্যুর চেয়ে তার দলের বরিষ্ঠ কর্মকর্তাদের ভাবিত করেছে পরবর্তী পঞ্চায়েত নির্বাচন।

"নরেনের অভাব মিটবে না। আবার নরেন নেই বলে নরেনের অভাব মিটবে না। আবার নরেন নেই বলে কাজ ফেলে বসে থাকলেও তো চলবে না। শক্ত হাতে সমস্ত সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। ভয় পেলে চলবে না।

আলোচনার মূল বিষয়টা সত্যই ভাববার। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে অর্জুনপুর অঞ্চলে ফ্রন্টই জিতেছিল। মোট এগারোটি আসনের মধ্যে নটি পেয়েছিল ফ্রন্ট, বাকি দুটি কংগ্রেস। এবার আর অবস্থা অত সহজ নেই। গত চার বছরে বিজয়ীরা যে পরিমাণে লোকের আস্থা হারিয়েছে, তার থেকে বেশি দুর্বল হয়েছে নিজেরা খেয়োখেয়ি করে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই থানায় বস্তুত ফ্রন্ট বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব এবারে ছিল না। কিন্তু ভোটের ফল বেরোবার পর বামপন্থীদের নানা কারণে ফ্রন্ট হতেই হয়েছে। কিন্তু

তখনও ব্যাপারটা তেমন সুখকর হ'য়ে ওঠেনি। কংগ্রেসীরা বামপন্থীদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও বিভ্রান্তির সুযোগে বিশেষ চেষ্টা ছাড়াই পাঁচটি আসন দখল করেছে। এ শুধু অর্জুনপুরের একার ছবিই নয়। সমস্ত জেলাজুড়ে বহু পঞ্চায়েতের ভাগ্য এরকম দড়ির উপরে ঝুলে আছে। পঞ্চায়েত সমিতিগুলোতেও বহু জায়গায় অবস্থা এরকমই বিশৃঙ্খল। এইসব বিশৃঙ্খলার কারণে সব থেকে বড় ধাক্কাটা গিয়ে লাগছে জেলা পরিষদে। জেলা পরিষদের গঠন যদিও এখনো মাস তিনেক বাকি, তবুও একথা অঙ্ক কষে ইতিমধ্যেই দেখা হয়েছে যে ফ্রন্ট যদি পরিষদে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়ও, তাহলেও বিরোধীদের সঙ্গে তাদের শক্তির তারতম্য থাকবে মাত্র একটি, কি, খুব বেশি হলে দুইটি আসনের। ফলে এখন থেকেই বাঘের খেলা শুরু হয়ে গেছে। সব পক্ষই সমান সজাগ।'' [১৫]

নরেনের খুন ছাড়াও উপন্যাসে আরেকটি খুনের ঘটনা আছে। যতীনের হাতে শঙ্কর বর্মনের খুন। নরেনের খুনের সঙ্গে দুটি রাজনৈতিক দলের যেমন সরাসরি যোগযোগ ছিল, এই খুনে তেমন নয়। কিন্তু এর পিছনের কারণটিও রাজনৈতিক। জমিদারদের অতিরিক্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন বামদলের দ্বারা গৃহীত একটি অন্যতম পদক্ষেপ। অধিচাষির বর্গারেকর্ড, কৃষিশ্রমিককে জমিদান যার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যেও যে কতটা দলাদলি, ফাঁকি ছিল তা সত্যিই আমাদের আশ্চর্য করে। জমিদার পদ্মবর্ণের দু-একর জমি চাষ করত যতীন। কিন্তু জমিভাগের সময় যতীন পায় এক-একর আর আরেক একরের পাট্টা পায় শঙ্কর বর্মন। কারণ– *"বিলিবন্দোবস্তে রাজনৈতিক দলগুলো অঞ্চলে নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করে।''* [১৬]

আর এই 'শক্তি' এবং 'সামর্থ' উভয়ই যতীনের ছিল না। উপরন্তু জমিতে ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় একেবারে ভেঙে পড়ে যতীন। কন্যাসম কলিকে ধর্ষণ করে, শঙ্কর বর্মনকে হত্যা করে। এখানে লক্ষণীয় যে দুর্বল ব্যক্তি যখন শোষিত, বঞ্চিত হয় তখন সে শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার চেয়েও দুর্বলের ওপর। কারণ সম্ভবত এই আক্রমণই তার দ্বারা সম্ভব এবং সহজসাধ্য।

উপন্যাসের আরেকটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে রাজেশ্বরী আখ্যান। যে রাজেশ্বরী রুগ্ন পিতা ও সৎ মায়ের সংসারে একেবারেই অনাকাঙ্খিত। বৃদ্ধ এক ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হয় এবং কিছুদিনের মধ্যেই তো বিধবা হয়। এই বৈধব্য অবস্থাতেই সে নতুন করে ঘর বাধার স্বপ্ন দেখে সুদর্শন যুবক বিমলের সঙ্গে। বিমলের ভগ্নিপতি গৌরাঙ্গের বাড়িতেই তারা মিলিত হয় এবং বিমল তাকে বিবাহের ভরসা দিয়ে ফিরে আসে। রাজেশ্বরী যখন অবিস্কার করে সে বিমলের ঔরসে সন্তানসম্ভবা তখন তার পরিবারের কাছে হয়ে ওঠে আরও অনাকাঙ্খিত। ফলে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয় সে। রওয়ানা হয় বিমলের উদ্দেশ্যে। এ যেন রাধিকার অভিসার। কিন্তু এবার তাকে নদী পার করে যে, সে কৃষ্ণ নয়, সে সাগর। রাজেশ্বরীর মতোই এক পোড় খাওয়া যুবক। যে অজান্তেই রাজেশ্বরীর দায়িত্ব নিয়ে নেয় নিজের কাঁধে, পৌঁছে দেয় তাকে যুগী যোগানের ঘরে। তার সকল কার্যকরণের পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছেন যে ব্যক্তি, তিনি হলেন গোপাল মজুমদার। এই গোপাল মজুমদারই 'ছায়ার পাখি' উপন্যাসের চালিকাশক্তি। তার চিন্তা-ভাবনা এবং কৃতকর্ম যেন উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রকে প্রভাবিত করেছে।

কলকাতার কলেজে পড়বার সময় থেকেই গোপাল মজুমদার এবং তার দুই ঘনিষ্ট বন্ধু শিশির ও ভবানীশঙ্কর সাম্যবাদী পার্টির সংস্পর্শে আসে। সেই সময়ের সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে উপন্যাসে এইভাবে –

"ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি নেতৃত্ব তখন যোশী-রজনীপাস দত্তের লাইন পার করে রণদিভের লাইনে আস্থা রেখেছে। কিন্তু ওদিকে তেলেঙ্গানার কৃষকযুদ্ধ ঝড় তুলেছে সারাদেশের মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট নেতৃত্ব চীনের নয়া গণতন্ত্রের লাইনকে এশিয়ার জন্য একটা নীতি হিসাবে ঘোষণা করেছে। জুকভ তেলেঙ্গানার কৃষক যুদ্ধকে অভিনন্দন পাঠিয়েছেন। কিন্তু এসব খবর পার্টির সাধারণ সভ্যদের কাছে এসে তখনো পৌঁছায়নি। যোশীর লাইন পার্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বলবৎ থাকাকালেই রণদিভের বক্তব্য পার্টির মুখপত্রে প্রকাশ হতে থাকে। পরবর্তীকালে

যোশীর লাইন দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী এবং রণদিভের লাইন বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী হিসাবে বিভিন্ন স্তরে সমালোচিত হয়। কমিনটার্নের লাইন এবং চীনা পথ সেই সময় থেকেই সাধারণ পার্টিসদস্য ও সমর্থকদের কাছে প্রবল আগ্রহের বস্তু হয়ে ওঠে। তাদের বিশ্লেষণে ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালের পর একটি আধা সামন্তবাদী আধা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়াল। সাধারণ কর্মী এবং বিপ্লবাকাঙ্খী বুদ্ধিজীবীর চিন্তা ও চেতনায় এই তত্ত্ব ক্রমশ দৃঢ় আস্থা অর্জন করতে থাকে।'' [১৭]

এমন একটি সামাজিক তথা রাজনৈতিক পরিসরে গোপাল, শিশির এবং ভবানীশঙ্কর গোপনে তাদের ভবিষ্যৎকে উৎসর্গ করেছিল বামপন্থী পার্টি ও সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে।

"তারা ঠিক করেছিল প্রথমে বিপ্লব এবং তারপরে বিপ্লবই নির্ধারণ করবে তাদের জীবন।'' [১৮]

কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। বিপ্লব নিজেই তার যথার্থ পথ অনুসন্ধান করে নিতে সমর্থ হয় নি আর তার আকাঙ্খীরাও তাদের জীবন সেই পথে বেশিদূর যথার্থ অর্থে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। আটোর গ্রামে শিক্ষকের চাকরি নিয়েছিল ভবানীশঙ্কর। পার্টির সিদ্ধান্তে গোপালকে আসতে হয়েছিল জলছুই, আর শিশির নিজের মহকুমা শহরে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির জোরে পার্টিতে ঢুকে বেশ দ্রুতই উন্নতি করতে শুরু করেছিল। তাদের পথ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল বটে, কিন্তু মতাদর্শ পরিবর্তিত হয়নি। ভবানীশঙ্কর ও শিশির যদিও পার্টির স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের জন্যও কিছু ভাবনা ভেবেছিল, কিন্তু গোপাল মজুমদার তা করতে পারে নি। জলছুই সে এসেছিল রাজশাহী দিনাজপুরের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগঠক অমিয় বিশ্বাসের আশ্রয়ে পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অমিয়র জমি দেখাশুনার অজুহাত নিয়ে গোপালের জলছুই আগমন এবং উদ্দেশ্য কংগ্রেস অধ্যুষিত অর্জুনপুর-জলছুই এলাকার কমিউনিস্ট পার্টির ভ্রূণ স্থাপন ও পার্টির মতাদর্শ বিস্তার। প্রথমত গোপাল এই কাজে যথেষ্ট উৎসাহ অনুভব করেছিল, উপরন্তু

অমিয় বাবুর কন্যা যমুনার প্রণয় সেই উৎসাহে আরও ইন্ধন জুগিয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে গোপাল পার্টিকর্মীদের অস্বচ্ছ অবস্থান আবিস্কার করতে লাগল। যে অমিয় বিশ্বাসের আশ্রয়ে সে এসেছিল, সেই উচ্চপদস্থ পার্টিকর্মী যে কতটা দূরে সরে এসেছেন পার্টির মতাদর্শ থেকে তা উপলব্ধি করতে পারে গোপাল।

"রাজনীতি যত বেশি মাত্রায় উপলব্ধি করছিল, অমিয় বিশ্বাসের এবং তার মত আরো অনেকের সুবিধাবাদী চরিত্র সে তত বেশি করে উপলব্ধি করছিল। অমিয় তেভাগায় সামিল হয়েছিল, কিন্তু নিজের আধিয়ারদের সঙ্গে উৎপন্ন ফসলের ভাগে এবং ব্যবহারে অন্যান্য জোতদারদের থেকে সে পৃথক ছিল না। এমনকি কৌশলে সে আধি উচ্ছেদও করছিল। বস্তুত, পঞ্চাশের দশক থেকেই পার্টি বর্গাজমির বর্গাদারি স্বত্ব রেকর্ড করাবার দাবী কার্যক্রম হিসাবে গ্রহণ করেছিল, শেষে ষাটের দশকে পার্টি দু ভাগ হওয়াতে তারাও দু ভাগ হয়েছিল। অমিয় ছিল পার্টির পুরানো নামের সঙ্গে আর গোপাল নিজেকে যুক্ত করল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা নতুন বন্ধনীযুক্ত নামের সঙ্গে। পরবর্তী পাঁচ বছরে অমিয়র পার্টির অস্তিত্ব জেলা থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন। অমিয় এবং অমিয়র মত কিছু মানুষ শুধু পরানো আমলের কমিউনিস্ট হিসাবে এখনো কিছুটা মৌখিক সম্মান পায়। আর গোপালের পার্টি ক্রমশ বাড়তে বাড়তে ষাটের দশকের শেষ দিকে আবার ভাঙ্গে। ..... পুরানো পার্টি থেকে নতুন পার্টিতে আসার একটা বিশেষ ব্যক্তিগত কারণ ছিল অমিয় বিশ্বাসের চরিত্র সম্যক উপলব্ধি। আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সে সামন্ততন্ত্রের এদেশীয় রূপ চিনেছিল। অমিয়র চরিত্রে সে খুঁজে পায় এদেশীয় এক আদর্শ সামতান্ত্রিক প্রতিনিধিকে।..... নিজের সংসারে অমিয় ছিল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, নিজের জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে অত্যন্ত হিসেবী এবং কৌশলী। আধিয়ার এবং ভৃত্যদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল পিতৃতুল্য। ফলে এদের কাছ থেকে অনেক বেশি আনুগত্য, শ্রম এবং ফসল আদায় করতে পারত সে। সব থেকে আকর্ষণীয় ছিল অমিয়র এইসব মানুষকে সংগ্রামমুখী করার শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি। ধান ওঠার সময় প্রতিবারই সে তার খামারে

যেত। তার নিজের খেলানে যখন ধান মারা হোত, সে একটা চেয়ারে বসে আধিয়ারদের সংগ্রামী শিক্ষা দিত, শত্রু-মিত্র, চেনাত, আগামী দিনের স্বপ্ন দেখাত।'' [১৯]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বামপন্থী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে দুই বিপরীতমুখী মতাদর্শের অবস্থান তৈরি হয়েছে। একদিকে সাম্যবাদী অন্যদিকে সামন্ততান্ত্রিক। অর্থাৎ বাস্তবিক অর্থে ব্যক্তিস্বার্থই প্রধান হয়ে উঠছে তাই হয়তো আজ কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শে বা রাজনীতিবিদের কথায় আস্থা রাখতে পারছে না সাধারণ জনগণ। আস্থা রাখতে পারে নি গোপাল মজুমদারও। পার্টি ভাগ হওয়ার পর গোপাল ভেবেছিল, 'ভণ্ডদের' হাত থেকে পার্টি রেহাই পাবে কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা হয়নি। একদিন পার্টিতে জঙ্গী হিসেবে পরিচিত পরমেশ্বরকে গোপাল দেখেছিল হাট থেকে 'একমুখী রুদ্রাক্ষের দানা' কিনতে। গোপাল ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক হতে শুরু করে। এরমধ্যে নকশাল আন্দোলন যখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন গোপাল স্বাভাবিক কারণে আরও দিশাহারা হয়ে ওঠে। কারণ–

"সে ভাল কম্যুনিস্ট হতে চেয়েছিল এবং বিপ্লব করে সমাজকে আমূল পরিবর্তন করতে চেয়েছিল।'' [২০]

ধীরে ধীরে তার অন্যমস্কতা আরও বাড়ে। আর এই অন্যমনস্কতাই ধীরে ধীরে নির্লিপ্ততার রূপ নেয়। পার্টি থেকে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তার বিচ্ছিন্ন হয়েছে তা ঠিক, কিন্তু সাধারণের জন্য দরদী মনোভাব সে ছাড়তে পারে নি। তাই সে এখনও সাগর, যুগী-যোগান, আদিবাসী যুবক সোম, অন্ধ ভিখারিনীর পুত্র জুনা এবং জলছুইবাসী বেশ কিছু প্রান্তিক জনগণের আশ্রয়স্থান, অভিভাবক। কিন্তু এই জীবনের সাথে কি সে সত্যিই অভ্যস্ত হতে পেরেছিল, না মনের কোথায় একটা আফসোস রয়ে গেছিল? বন্ধু ভবানীশঙ্করের সঙ্গে দীর্ঘদিন পর দেখা হওয়ার পর নিভৃত আলাপচারিতায় অনাবৃত হয় গোপাল মজুমদারের বেদনা :

"ক্রমশ একটা নিষ্ক্রিয় স্থবির, বাতিকগ্রস্ত মানুষ হয়ে বহন করছি এই অসম্ভব একাকিত্ব। আমি পেশাদার বিপ্লবী হতে চেয়ে হাল ধরতে শুধু শিখিনি, সেই কাজ করছি

দীর্ঘদিন ধরে। আমি হয়েছি হাটুরে দোকানের চা-ওয়ালা। আমি শহর, নাগরিক মানুষ, অসম্ভব আকর্ষণীয় বুদ্ধিজীবী সংসর্গ, স্বজন এবং ব্যক্তিস্বার্থ সবই ত্যাগ করেছিলাম। ভবানীশঙ্কর, তুমি অন্তত জানো, আমি কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে এসব পালন করেছি। কিন্তু ঐ আন্দোলনে আমি যোগ দিতে পারিনি। সত্তর সালেই আমার ভিতরের দ্বন্দ্ব আমাকে এগোতে বা পেছোতে দেয়নি। তারপরে তো সবই শেষ হয়ে গেল। ফলে, আমি হয়ে রইলাম চাষা কিম্বা চা-ওয়ালা এই দশ-বারো বছর ধরে। আফসোস হবে না? [২১]

এই আফসোস কেবল নিজের জীবনের স্থবিরতার জন্য নয়, এ আফসোস যে পরিবর্তনের আকাঙ্খা গোপালের মতো মানুষেরা করেছিল তাদের ব্যর্থতায়। কিন্তু আফসোস করেই বসে থাকার পক্ষপাতী নয় সে। তাই যখন সম্পূর্ণ জলছুই আড়বেঁকি বন্যা প্লাবিত হয় তখন সাগরকে সঙ্গী করে নতুন উদ্যমে জনগণের উদ্ধারের কাজে লেগে যায় সে। এই উদ্যম, এই পরোপকার, এই সক্রিয় অংশগ্রহণই সে শিখেছে তার রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে। সে প্রশ্ন করতে শিখেছে, সে বিপ্লব করতে শিখেছে। এই বিপ্লব যতই তৃণমূল স্তরের হোক না কেন। বন্যাপ্লাবিত, বন্যাবিধ্বস্তদের জন্য রিলিফ আসছে, কিন্তু এই রিলিফের মান এবং পরিমাণের ন্যুনতার বিরুদ্ধে সোচ্চার আওয়াজ তোলে গোপালই–

"ইস্কুলের ক্যাম্পে নোংরা দুর্গন্ধের মধ্যে পোকামাকড়ের মত ওলোটপালট খাচ্ছে মানুষ। কি রিলিফের বন্দোবস্ত করেছে তোমার সরকার? শুকনো চিঁড়ে অবশ্য কিছু এসেছে এটা ঠিক। কিন্তু কয়েকবস্তা শুকনো চিঁড়ে এক ড্রাম ব্লিচিং পাউডার, দু-চারখানা পলিথিন শীট, এই নিয়ে দলাদলির বহর তো দেখছোই। যারা খাটতে চায় তাদেরও করার মত বিশেষ কিছু নেই।'' [২২]

রিলিফের খাবার দাবারের মান নিয়ে সোচ্চার হতে দেখা যায় আরেক ব্যক্তিকে, তিনি হলেন কংগ্রেস দলের কেন্দ্রীয় নেতা বশিষ্ট বাবু, যিনি 'জলে বন্যায় হেজে যাওয়া' মানুষগুলোর সামনেও দাম্ভিক কর্তৃত্বপরায়ণ দাপুটে দম্ভ নিয়ে নাকে রুমাল চেপে

পরিদর্শন করেন (যদিও সাংবাদিকের উপস্থিতি লক্ষ করে যথাসময়ে রুমালটি নাক থেকে সরেও যায়) এবং পরিস্থিতির সমালোচনা করেন। তবে তার এই সমালোচনার পেছনে সাধারণের প্রতি দরদের চেয়ে ব্যবস্থার ত্রুটিটা খুঁজে বের করাই মুখ্য কারণ কেননা ব্যবস্থাপক জেলার যে নেতাব্যক্তি তিনি বশিষ্ট বাবুর বিরোধী দলের।

কিন্তু গোপালের মধ্যে এ ধরনের কোন ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিকগত ছ্যুৎমার্গ লক্ষ করা যায় না। কারণ–

"....ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যা ও সম্পর্কগুলোর বিচার গোপাল খুব আলাদাভাবে করতে চায় না। তাই নিজের সম্পর্কেও মোহমুক্ত।'' [২৩]

এই মোহমুক্ততাই তাকে বন্যাক্রান্তদের সেবায় ওতোপ্রতভাবে জড়িয়ে যেতে সাহায্য করে। সে জানে,

"ষাট এবং সত্তরের দশক আর কোনওদিন ফিরে আসবে না। সেসব চিন্তা, কর্ম, আদর্শ এবং স্বপ্নও আর ফিরে আসবে না।'' [২৪]

কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণের সেবার মধ্য দিয়ে সেই কর্ম, সেই আদর্শকেই যেন আবার নতুন করে খুঁজে পায় গোপাল, খুঁজে পায় তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা এতদিনকার উদ্যম। এখন আর তার বিবাহসূত্রে পাওয়া জমির জন্য নিজেকে হীন মনে হয় না, কন্যার আত্মহত্যার জন্যও নিজেকে দায়ী মনে হয় না। আজ সাধারণের সেবার মধ্য দিয়ে গোপাল মুক্ত হয়। সে জানতে পারে তার খারাপ ধরনের জন্ডিজ হয়েছে, তাকে কলকাতা চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছে তার বন্ধু শিশির ও ভবানীশঙ্কর। প্রথমে সে আপত্তি করে তারপর মেনে নেয়। হয়তো ভাবে সুস্থ হয়ে আবার সেই মানুষগুলোর কাছে ফিরে আসতে পারবে সে।

এইভাবে একটি চরিত্রের মধ্যদিয়ে যথার্থ রাজনৈতিক জননেতার আদর্শকেই যেন এঁকেছেন লেখক অভিজিৎ সেন। লেখকের নিজের ব্যক্তিগত জীবনের রাজনৈতিক

যোগাযোগের ইতিহাস, বহুশাখায় বিভক্ত বামপন্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনা, কিন্তু আবার মতাদর্শগত দিক থেকে একটি নির্দিষ্ট তত্ত্বপ্রস্থানে আস্থা রেখে চলা– এ সমস্তই গোপালেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এতে লেখকেরই আত্মার যোগাযোগ রয়েছে বলেই হয়তো এই Life Like উপন্যাসটি নিয়ে লেখকের এতটা উচ্চাশা ছিল। আর উপন্যাসটি পড়ে পাঠকও তাঁর এই উচ্চাশার যথার্থতা অনুভব করতে পেরেছেন। এই উপন্যাসটি লেখার পর বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মতামত জানার জন্য অভিজিৎ সেন এই বইটি প্রবাদ প্রতিম শিল্পী সোমনাথ হোর, অধ্যাপক পবিত্র সরকার প্রমুখদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। উত্তরে সোমনাথ হোর যা লেখেন, পাঠক হিসেবে আমাদের সকলেই উপন্যাসটির বিষয়ে সমান অভিমতই পোষণ করি–

"..... 'ছায়ার পাখি' পড়ে বড় তৃপ্তি পেয়েছি। কেবলই মনে হচ্ছে আমাদের দেশেও ভিন্নরূপে 'War & Peace' এর মত লেখা হতে পারে। একটা শক্ত কাঠামো আর তাকে ঘিরে খুঁটিনাটির পর্যবেক্ষণ এবং অনাবিল রসসৃষ্টি – পড়তে পড়তে এগুলি উপলব্ধি করলাম।'' [২৫]

'ছায়ার পাখি'র পর আমাদের আলোচ্য উপন্যাস হলো 'অন্ধকারের নদী'। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি কীভাবে গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত গুলোকে কেন্দ্র করে আধিপত্যবাদের নতুন রাজনৈতিক বীজ রোপিত হচ্ছে। 'অন্ধকারের নদী' উপন্যাসটিতে এই পঞ্চায়েত রাজ-এর নানা অসঙ্গতি গুলোই বি.ডি.ও অশোক এর কথনে আমাদের সামনে উঠে এসেছে। একটি গ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নই সেই গ্রামের পঞ্চায়েতের প্রধান লক্ষ। যেহেতু গ্রামাঞ্চলে জল পরিবহনের সুব্যবস্থা তেমন নেই, তাই দৈনন্দিন প্রয়োজনের সঙ্গে ক্ষেত কৃষির ক্ষেত্রেও বহুলাংশে নির্ভর করতে হয় জলাশয়, পুকুর, কুয়া ইত্যাদির ওপরে। একটি গ্রামে সরকারের পক্ষ থেকে কয়টি কুয়ো খনন করা হবে তার সিদ্ধান্ত নেয় পঞ্চায়েত। সরকারের দ্বারা আবন্টিত ও বরাদ্দকৃত অর্থ নির্দিষ্ট অফিস, ব্লক ইত্যাদির মারফৎ পঞ্চায়েতে আসে, এবং সেই অর্থ দিয়ে পরবর্তী কার্য সুচারুরূপে

নির্বাহ করবার দায়িত্ব পঞ্চায়েতের। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটির প্রতিটি পদক্ষেপে যে কী ভয়ংকর রকমের অসততা, দ্বিচারিতা লুকিয়ে আছে, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি 'অন্ধকারের নদী' উপন্যাসে। কীভাবে কিছু স্বার্থান্বেষী লোকের উস্কানিতে গ্রামবাংলার জীবনে ঘনিয়ে উঠছে নারকীয় অন্ধকার– তারই আখ্যান 'অন্ধকারের নদী'। আলোকরঞ্জন চক্রবর্তীর মতে *"এই অন্ধকার আসলে সামগ্রিক অবক্ষয় বা পচন।"* [২৬]

এই পচন ধরে যাচ্ছে সমাজের, রাজনীতির একেবারে কেন্দ্রস্থলে। তাই এখানে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত আর সৎ ব্যক্তি এখানে অক্ষম যার সার্থক উদাহরণ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অশোক।

অশোক কলকাতার মানুষ। জেলার সবচেয়ে অনুন্নত পানজোড়া ব্লক-এর বি.ডি.ও হয়ে সে এসেছে গ্রামে। এসে একটা সম্পূর্ণ নতুন পরিসরে সে পরতে পরতে আবিষ্কার করে চলেছে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন, গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার নানা খুঁটিনাটি, এবং গ্রামীণ রাজনীতির নানান জটিল গ্রন্থি। রাজনীতির উপস্থিতি সময়ে তথা সমাজে স্বাভাবিক, কিন্তু তা যখন কিছু রাজনৈতিক দলের পারস্পরিক দলাদলি, কিছু শক্তিধারী ব্যক্তির স্বার্থান্বেষী ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় তখন যে তা কত ভয়ংকর রূপ নিতে পারে তা অশোক তার অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছে। চাকরিতে জয়েন করার পর পুরো ব্লকটির পরিদর্শন তথা পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে ড্রাইভার 'বিমলদা' কে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে অশোক মুখোমুখি হয়েছে এক জটিল ষড়যন্ত্রের। পানজোড়া ব্লকের অন্তর্গত কাঞ্চনপুরের পঞ্চায়েত প্রধানের 'চাকরি' করা অমরনাথের মুখোমুখি হয়েছে অশোক। এই কাঞ্চনপুর গ্রামটি অশোকের কর্মক্ষেত্রে পড়ে এবং একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সে সেখানে এসেছে–

"কুয়ো খোঁড়ার জন্য তার আগের বিডিও-র আমলে টাকা দেওয়া হয়েছিল সব কটা গ্রাম পঞ্চায়েতকেই। তার আগের ব্যক্তি অফিসার হিসাবে অপদার্থ ছিল, এ কথা সদরের কালেক্টরেটে সবারই জানা আছে। উপরন্তু সে ছিল উত্তরের পার্বত্য জেলার

মানুষ। অশোকদের নিজস্ব মহলে যাদের কোড নাম 'নেপু'। ইদানিং হিমালয়ের পার্বত্য জাতিগুলির প্রচুর ছেলে বিশেষ কোটায় ডব্লু বিসিএস চাকরীতে এসেছে। তাদের মধ্যে বেশ কিছু ছেলে অকর্মা এবং ফাঁকিবাজ হিসাবে চাকরির শুরুতেই নাম কিনেছে। পানজোড়া ব্লকের পূর্বতন জনৈক ডিম্বো বড়বাবুর ভরসায় অফিস করত এবং বাড়িয়ে দেওয়া যে কোন কাগজে সেই করত। তার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, কোন রকমে মেয়াদ শেষ করে এবং মুরুব্বি ধরে দার্জিলিংয়ে গিয়ে খুঁটি গেড়ে বসা। সে প্রচেষ্টা তার সার্থক হয়েছে এবং অশোকের জন্য বেশ কিছু পাপ সে ফেলে রেখে গেছে। কাঞ্চনপুরে কুয়ো খোঁড়া তার মধ্যে একটি।'' [২৭]

অশোক তাই অমরনাথের কাছে কুয়ো খোঁড়ার ব্যাপারে জানতে চায়, কিন্তু এই প্রশ্নে পঞ্চায়েত প্রধানের অস্বস্তিই কাজের পরিমাপ অশোককে বুঝিয়ে দেয়। কেরানিবাবু জানান মোট তেরোটা কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল। অশোক দু-একটা কুয়োর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেই এর মান উপলব্ধি করতে পারে। কুয়ো খোঁড়ার নামে কেবল তিন-চার হাত গর্ত হয়েছে কোথাও কোথাও। আবার কোথাও সেটুকুও নেই। কাজ হচ্ছে না কেন তা জানতে চাইলে প্রধান জানায় –

"টাকা পয়সা বন্ধ করি দিলেন তো কামকাজ হোবে কেমন করে? টাকা যা দিলেন সে তো কবেই শ্যাষ।'' [২৮]

'টাকা শ্যাষ' হয়ে যায় কিন্তু কাজ এগোয় না, কেননা টাকার মোটা অংশই চলে যায় আধিকারিকদের পকেটে ধাপে ধাপে। এই পরিস্থিতি কেবল উপন্যাসে আলোচিত বিশেষ ব্লকে বিশেষ গ্রামটির ক্ষেত্রে নয়, এ আজকের গ্রামভারতের একটি সাধারণ সত্য। আর এই সত্যকে মেনে নিয়ে নিজের আখের গুছোনোকেই যুক্তিযুক্ত বলে মেনে চলেন বেশিরভাগ তত্ত্বাবধায়কেরা। কিন্তু অশোক এই পথে চলতে রাজি নয়, সে বলে–

"আমি তো মহৎ হতে চাই না, আমি সাধারণ সৎ মানুষ হয়ে থাকতে চাই।'' [২৯]

কিন্তু 'সৎ' হয়ে থাকাটাই তার জীবনে কাল হয়ে দাড়ায়। পঞ্চায়েত সমিতির

সভাপতি অনাদির সঙ্গে তার বিরোধ বাধে, ঠিকাদার বিপ্লব তাকে শাসায়, শুভাকাঙ্খী ড্রাইভার বিনয় তাকে সাবধান করে। কিন্তু অশোক নির্লিপ্ত ক্রীড়নক মাত্র হয়ে থাকতে পারে না। কারণ সম্ভবত–

"অশোক যুবক হয়েছে সত্তরের দশকে। সত্তরের দশকে যারা যুবক হয়েছে, তাদের মধ্যে একটা অংশ অবশ্যই দশকের কাছ থেকে নৈতিকতা ও সাহসিকতার শিক্ষাটা পেয়েছে। এরকম এর আগে কখনো হয়েছে কি না সন্দেহ। বিনয়ের মুখ থেকে সবিস্তারে শোনার পর নিজের নিরাপত্তার কথা তৎক্ষণাৎ ভাবে না সে। সে ভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধঃপতনের ব্যাপকতার কথা। তার রোখ বাড়ে।'' [৩০]

ক্ষুব্ধ অশোক ওপরতলায় অভিযোগের জন্য প্রস্তুত হয়। এম,বি তে একশো চল্লিশ ফুট লেখা টিউবওয়েল একটাও যখন সত্তর ফুটের বেশি গভীর পাওয়া যায় না, তখন সে অফিসে কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়। পার্টির জেলা কমিটির সদস্য তরিৎ অশোককে এসব মিটমাট করে নেওয়ার পরামর্শ দেয়। তার সুরে যদিও পরামর্শের চেয়ে শাসানির ভাবটিই বেশি থাকে। কারণ সে তার রাজনৈতিক অগ্রসরতার মুখে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা চায় না। তাই বলে–

".... লোকসভার নির্বাচন খুব শিগগিরই হবে। কাজেই এই ব্লকের ভোট যদি আমাদের বিপক্ষে যায় তবে সেক্ষেত্রে বিফলতার জন্য কিন্তু আপনার দায়িত্বও এড়াতে পারবেন না। এ কথাগুলো আপনাকে পরিস্কার করে বলাই ভালো।'' [৩১]

অশোকের চোখে ধীরে ধীরে পঞ্চায়েত রাজনীতির মিথ্যাচার, ভ্রষ্টাচার, উন্নয়নের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের কলঙ্কজনক ইতিবৃত্তগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে সে উপলব্ধি করতে পারে যে, শহর থেকে যে নীতি নির্ধারিত হচ্ছে, তাই গ্রামে পৌঁছাচ্ছে। গ্রামের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য এই নাগরিক রাজনীতির বিকৃত অন্ধকারে ঢাকা পড়ছে গ্রামজীবন। শুধু পঞ্চায়েতে নয়, ঘূণ ধরে গেছে আজ সমস্ত প্রশাসনেই। ভ্রষ্টাচার বাসা বেঁধেছে রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কিন্তু এই প্রচলিত অবস্থা থেকে সহজে

বাইরে বেরিয়ে আসার সম্ভব হয় না। তাই–

"প্রশাসনের বাঁধা কথাগুলো অশোককে বলতেই হয়। ছক বাঁধা, স্তোক দেওয়ার জন্য কতগুলো মিথ্যা কথা বলতে তার ঘেন্না লাগে, তবুও। রাজ্যস্তরে মন্ত্রীসভা, জেলাস্তরে জেলাশাসকরা এবং ব্লকস্তরে বিডিও-রা এক বিচিত্র প্রতিযোগিতায় ভোগে। প্রতি ব্লকে বছরে অন্তত দুশো পরিবারকে দারিদ্রসীমার ওপরে তুলতে হবে, এই হল লক্ষ্যমাত্রা। কোনো ব্লক দেড় হাজার, কোনো ব্লক আড়াই হাজার তাদের লক্ষ্য পূরণ করে রেখেছে। অর্থাৎ এই পরিমাণ দরিদ্র মানুষের কাগজপত্র ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে বসে আছে। কোনো জেলাশাসক করেছে চল্লিশ হাজার, করে খুব আত্মপ্রসাদে ছিল। হঠাৎ খবর আসে পাশের জেলার পঞ্চাশ হাজার হয়ে গেছে। আবার তোড়জোড়, আবার কাগজ তৈরি করা। ডি.আর.ডি.এ মৎস্যচাষ দপ্তর, আদিবাসী দপ্তর, তুঁতচাষ দপ্তর কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি হিসাবে ব্যাঙ্কের শাখায় শাখায় পাঠিয়ে নিজেরা খালাশ হচ্ছে। ব্যাঙ্ক তখন পুরো বিষয়টাকে নিজের কায়দায় ল্যাজে খেলাচ্ছে। ভর্তুকির টাকা একই সময়ের দীর্ঘদিন যাবৎ নানা কায়দায় ঋণ এবং আমানত হিসাবে তাদের হিসাবের খাতায় শোভা পাচ্ছে। তাতে ওপরওয়ালার কাছে ম্যানেজারদের বুদ্ধিমত্তা ও উপযুক্ততা প্রমাণ হচ্ছে। এতে আখেরে লাভ হয়। আর সব থেকে বড় কথা, কী সরকারি কী বেসরকারি, সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত এই টাকা একটা বিশাল সুবিধাভোগী শ্রেণিকে লাভবান করছে।

এই হচ্ছে সার্বিক গ্রামোন্নয়ন। এইভাবে লক্ষ লক্ষ পরিবার পরিসংখ্যানে স্বয়ম্ভর করার পৃথক পৃথক পরিকল্পনার আর্থিক বিন্যাস অশোক আরও অনেকের মতোই মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে না। তার আক্ষেপ আরও অনেকের মত 'হায় চাকরি', 'হায় অন্নদাস' স্তর পর্যন্তই থাকে।'' [৩২]

'গ্রহণ করতে পারে না' বলেই সে প্রথমে প্রতিবাদের পথ বেছে নেয়, ফলস্বরূপ পায় সরকারি নির্দেশ। আপাতত দু-মাসের জন্য তাকে ছুটি নিতে বলা হয়। সরাসরি

রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের বে-আইনি বিরোধিতার জন্য সরকার তার ওপর বিরক্ত হয়ে তার সম্পর্কে ব্যবস্থা নেবার জন্য তৈরি হচ্ছে। অশোক বুঝতে পারে সত্যিই–

"একই সঙ্গে সৎ, নিরপেক্ষ এবং নির্বিরোধ থাকা কখনো সম্ভব নয়।" [৩৩]

এখানে কথকসত্তা আর লেখকসত্তা একাকার। আশোকের আড়ালে কথা বলছেন স্বয়ং অভিজিৎ, বুঝতে অসুবিধা হয় না। সত্তরের দশক শুধু অশোককেই সাহসী করেনি, প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে উপন্যাসকারকেও। 'অন্ধকারের নদী' উপন্যাসের একটা জায়গায় দেখা যায় ঠিকাদার বিপ্লব যখন অশোককে তার অফিসে এসে শাসিয়ে যায় তখন অশোক যেন অবচেতনেই তার বসে থাকা ঘরটির দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। দেখে–

"পুরোনো বাড়ির ড্যাম্প ধরা দেয়ালে গান্ধীর ছবিতেও ড্যাম্প। ছবিখানা এখন প্রাচীন উদ্ভিদের জীবাশ্মের মতো দেখায়। ডানদিকের দেয়ালে জওহরলাল নেহেরুর রোগা চেহারা, একখানা অত্যন্ত সাধারণ কাঠের চেয়ারে উপবিষ্ট। এরকম তুলনা খুবই অর্থহীন, তবুও তার মনে হয়, তার নিজের চেয়ারখানা ওই চেয়ারের থেকে অনেক দামি। ..... বাড়িটার অন্যপ্রান্তে সভাপতির চেম্বার। সেখানে চেয়ার টেবিল আরো মনোহর, নতুন। সেখানকার দেয়ালে চওড়া ফ্রেমের বড়ো বড়ো আকারের ছবি– মার্কস, লেনিন, হরেকৃষ্ণ কোঙার। কিন্তু বাড়িটা তো সেই কবেকার, সর্বাঙ্গে যার নোনা আর ঘূণ। কাজেই মার্কস, লেনিন, হরেকৃষ্ণ কোঙার অচিরেই নোনা আর ঘূণের শিকার হয়ে গেছে।" [৩৪]

চিহ্নায়ক খচিত এই ভাষা। মার্কস, লেনিন, গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, হরেকৃষ্ণ কোঙারের ছবি দেয়ালে শোভা পাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তাদের ছবিতে যেভাবে নোনা ও ঘূণ ধরেছে, তেমনিই ঘূণ ধরে গেছে তাঁদের মহৎ নীতি আদর্শেও। আজ আর কোনও মতাদর্শই প্রভাবিত করতে পারছে না স্বার্থান্বেষী মানবকুলকে। তাই এই ছবিগুলি

কেবলমাত্র অবচেতনে হতাশার দীর্ঘনিশ্বাসের আধার হয়েই রয়ে গেছে।

রাজনীতির সাথে আরেকটি বিষয় যা ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তা হলো সাম্প্রদায়িকতা। ধর্ম অর্থাৎ যাকে আমরা ধারণ করি। অর্থাৎ ধর্মের স্রষ্টা মানুষই। কিন্তু প্রকৃত অর্থে দেখা যায় ধর্মই ব্যক্তিকে যেন ধারণ করছে, নির্ধারণ করছে তার গতিপ্রকৃতি। যাকে আশ্রয় করে একদা মানুষ সশক্ত হতে চেয়েছিল, তা-ই হয়ে গেছে দুর্বলতার স্থান। আর এই দুর্বলতা নিয়ে রাজনীতি চলছে সর্বত্র। ধর্মকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ রণকৌশল তৈরি করছে। আর সাধারণ মানুষ এই রণকৌশলের লুকোনো ফাঁদে পড়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে। অভিজিৎ জনপ্রদপ্রয়াস পত্রিকায় দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন–

"ধর্ম যে আফিম, মার্কসের এই কথাটা কত বামপন্থীকে যে কোনঠাসা করেছে এবং এখনো করছে তার আর শেষ নেই।

আসলে এই তত্ত্বটার মধ্যে কোন গোলমাল নেই। যে মানুষ মাদক গ্রহণ করে সে বড় অসহায় মানুষ। ধর্ম যে এক ধরনের মাদক মানুষকে যে তা আচ্ছন্ন করে রাখে, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে কারো?'' [৩৫]

এই মাদকতার এক ভয়ংকর রূপ দেখতে পাওয়া গেছিল আটের দশকে। বাবরি মসজিদ ভাঙন ও রামমন্দির প্রতিষ্ঠা ইস্যু নিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান দৃঢ় করতে উঠে পড়ে লেগেছিল কিছু রাজনৈতিক দল, আর সেই প্রক্রিয়ার বলি হয়েছিল কয়েক হাজার সাধারণ ধর্মভীরু মানুষ। 'আঁধার মহিষ' সেই সময়ের রাজনীতির এক শৈল্পিক রূপায়ণ। লেখক অভিজিৎ সেনের ভাষায়–

"আটের দশকের পুরো সময়টা জুড়েই বাবরি মসজিদ তথা সারা দেশ জুড়ে আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের উচ্ছেদের জন্য ব্যাপক বন্দোবস্ত হচ্ছিল। সেই উন্মাদনায় গ্রাম এবং মফস্বল শহরের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, এমনকি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরাও কীভাবে সারা দিচ্ছিলেন, 'আঁধার মহিষ' তার দলিল।'' [৩৬]

‘আঁধার মহিষ’ উপন্যাসটি আলোচনার পূর্বে এই উপন্যাসটি যে সময়ের দলিল, সেই সময়টাকে একটু বুঝে নেওয়া দরকার। সেই নির্দিষ্ট সময়টার প্রভাব লেখকের উপর কতটুকু এবং কীরকম তা লেখক নিজেই জানান –

“গত শতকের আটের দশকের প্রায় প্রথম থেকেই বিশ্বহিন্দু পরিষদ প্রায় দু-দশকের জাড্য ত্যাগ করে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠল। তাদের জঙ্গীপনা জাহির করা শুরু করল সারা দেশ জুড়ে। রামজন্মভূমি আন্দোলন বিশ্বহিন্দু পরিষদের পালে যে অনুকূল হাওয়া তুলেছে, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষও সে কথা বুঝতে পারছিল। যতই দিন যাচ্ছিল বিশ্বহিন্দু পরিষদের একাত্মতা যজ্ঞ, রাম জন্মভূমি আন্দোলন, জয়শ্রীরাম রণধ্বনি ক্রমশ সাধারণ মানুষের ভিতরে প্রসার লাভ করছিল এবং একধরণের গণ সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিচ্ছিল। একটা গণহিস্টেরিয়া ক্রমশ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। প্ররোচনা, গুজবে, মিথ্যায় বিষয়টা হিন্দুত্ববাদীরা এমন উচ্চতায় ওঠাতে সমর্থ হয়েছিল যে অনেক কালের পরীক্ষিত অসাম্প্রদায়িক মানুষকে পর্যন্ত সে সময় নানা ধরনের নিন্দনীয় কথার্বাতা, আচরণ বলতে ও করতে দেখেছি। এই সব মানুষের মধ্যে বয়স্ক বামপন্থীরাও ছিল যারা জীবনে অনেক কিছুই দেখে এসেছে।

অনেকের মতো আমিও বুঝতে পারছিলাম একটা ঝড় আসছে। ভারতবর্ষের বিবেকবান, যুক্তিবুদ্ধিযুক্ত মানুষ এই ঝড়কে ঠেকাতে পারবে কি না তাতে আমার সন্দেহ ছিল।

একক ব্যক্তি হিসাবে, লেখক হিসাবে সমাজের একজন সদস্য হিসাবে যখন যেভাবে সম্ভব হয়েছে প্রতিবাদ করেছি, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, ইতিহাস সমাজতত্ত্ব উদ্ধৃত করেছি। তাতে অপমানিত হয়েছি, গালাগাল খেয়েছি, দালাল আখ্যা পেয়েছি। কখনো কখনো অসম্ভব হতাশাও পেয়ে বসেছে।.....

এই কথাগুলো আমি বললাম এই কারণে যে সেই সময় সারা দেশজোড়া

সাম্প্রদায়িক সন্দেহবিদ্বেষ, মিথ্যাচার ইত্যাদি কারণে আরো অনেকের মতো আমি নিজে এত বিক্ষুব্ধ হয়েছিলাম মানবিকতাকে এত বিপন্ন দেখেছিলাম, যে মনে হয়েছিল এ থেকে বোধ হয় আমাদের আর নিষ্কৃতি নেই।'' [৩৭]

অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার আপাদমস্তক বেষ্টনীতে যখন গোটা সমাজ ও রাষ্ট্র আবদ্ধ তখনই সেই সময়ের আখ্যান উঠে এলো লেখক অভিজিৎ সেনের কিছু বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনায়, 'আঁধার মহিষ' যার মধ্যে অন্যতম।

বালুরঘাট মহকুমার কুমারগঞ্জ থানার একটি অঞ্চলকে পটভূমি করে 'আঁধার মহিষ' উপন্যাসটি লিখেছেন অভিজিৎ। *"উপন্যাসে নদী যমুনার নামের আড়ালে আত্রাই নদীটি আছে। গ্রামের নাম গুলোও ছদ্ম। ঘাটোয়াল এবং নৌকার মাঝির নাম''* [৩৮] লেখক যেমন দেখেছেন তেমনিই তুলে এনেছেন তাঁর রচনায়। অর্থাৎ একথা অনায়াসে বলা যায় যে রচনাটি কোন বানানো গল্প মাত্র নয়, এর একটি যথার্থ বাস্তব পটভূমি রয়েছে।

পিরগঞ্জ অঞ্চলটিতে এতকালধরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বাস ছিল। যেমন মোকাম, মসজিদ রয়েছে, তেমনি শীতলা, কালী, বুড়্হি-র থানও রয়েছে। বুড়্হি-র থানে উৎসবে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই মানতের ত্যানা বাঁধে শর গাছে, আর মানত পূর্ণ হলে গোস্ত-এর ভোগও বিলি হয়, মুসলমানেরা হিন্দুদের কথা মাথায় রেখে পাঁঠার গোস্ত ভোগ দেয়। বিরাজমোহন, আমজাদদের মতো কিছু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লোক তো রয়েছেই, কিন্তু তাদের এই মনোভাব জনগণকে এতকাল প্রভাবিত করতে পারে নি। কিন্তু একটা ঘটনা কীভাবে মানুষকে সাম্প্রদায়িকভাবে সক্রিয় করে তুলছে তাই উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে। পিরগঞ্জের মত জায়গাও ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক অনুভূতিপ্রবণ। এতকাল যে পিরগঞ্জে সংঘের কাজকর্মে কোন ধর্মীয় রাজনীতির রঙ এসে মেশেনি, সেখানেও ধীরে ধীরে সেই গেরুয়া রঙে এসে খাকিরঙ মিশতে থাকে। ফলে পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতার হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক দলগুলি সংঘাত বাঁধায়, মানুষ খুন হয়। খবর ছড়ায়–

"সিপিএম এবং আরএসএস- এর মধ্যে একটি খেলার মাঠের দখল নিয়ে কিছুদিন যাবত নাকি রেষারেষি চলচিল, তার পরিণতিতে এই খুন।" [৩৯]

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে রাজনীতি মিশে যাচ্ছে। সভায়, পঞ্চায়েত মিটিং-এ একদল অপর দলের ওপর সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনছে, আবার ব্যক্তিগত স্তরে নিজেরাই সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থন করছে।

কামাল হোসেন অলকানন্দা চট্টোপাধ্যায়ের পরিণয় এই পরিস্থিতিতে আগুনে ঘি ঢালার কাজ করেছে। প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় বৈবাহিক সম্পর্কে বাঁধা পড়া এই যুগলকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক রঙে রাঙানো নতুন রাজনীতি গড়ে উঠছে। স্কুল মাস্টারির ইন্টারভিউ দিতে যাওয়া অলকানন্দার সার্টিফিকেট, শৈক্ষিক যোগ্যতার চেয়েও অধিক গুরুত্ব পাচ্ছে তার বিবাহ বিষয়, অধিক আলোচনার রসদ যোগাচ্ছে তার স্বামীর নাম ও উপাধি। নানান গুজব রটছে আর চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে নিমেষের মধ্যে। কোথায় কোন জায়গায় দেবীমূর্তিকে অপবিত্র করে দিয়েছে কোন মুসলমান যুবক, কোথায় কোন হিন্দু শিশুর প্রস্রাব মুসলমানের শরীরে লাগায় সে শিশুটির দুই পা ফাঁক করে চিড়ে দিয়েছে। এই খবর গুলো ছড়াচ্ছে আর দাঙ্গাবাজেরা পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে দিয়ে মজা লুটছে। কামাল-অলকানন্দাও রটনার হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। জেলার ডি.এম. এসে বিডিওর কাছে জানতে চাইছেন–

"তোমার ব্লকে একটি হিন্দু মেয়েকে নাকি কোন মুসলমান মাস্টার জোর করে বিয়ে করেছে?" [৪০]

অলকানন্দা-কামালকে নিয়ে নতুন করে রাজনীতি গড়ে উঠছে। হিন্দুত্ববাদী বিরাজমোহনের হাত থেকে কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে একজন মুসলমানের হাতে স্কুলের কর্তৃত্ব দেওয়ার জন্য কথায় কথায় কোরান হদিসের উদ্ধৃতি আওড়ানো স্কুলের সেক্রেটারি আমজাদ হোসেন কামালকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। নিজের সাম্প্রদায়িক মনোভাব

কামালের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায়, কিন্তু পারে না। কামাল দৃঢ়ভাবে জানায়–

"মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবন যে ভীষণভাবে এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে কোরান ও হাসিদ নির্ধারিত, এই বিপজ্জনক মতবাদে তো আস্থাশীল নয়।'' [৪১]

কামাল দৃঢ়ভাবে বলে সত্য, কিন্তু সেও দুর্বল হয় যখন অলকানন্দার উপর আক্রমণ হয়, সিকান্দারের মত কিছু অসৎ গুণ্ডা তাদেরকে অশ্লীল গালিগালাজ করে, তার স্ত্রীকে অপমান করে। কামাল দুর্বল হয়, মনের দৃঢ়তায় আঘাত লাগে, কিন্তু সে ভাঙে না। অলকানন্দা তাকে ভাঙতে দেয় না। বলে–

"কামাল। এ সমাজ কাউকে খাতির করে না, সাহায্য তো করেই না। সে তুমি মুসলমান বলে বিশেষ করে নয়। এর মধ্যেই আমাদের বন্ধু-স্বজন-খুঁজে বের করতে হবে। বাসস্ট্যান্ডে যারা তোমাকে লাঞ্ছনা করেছে, কিংবা সিকান্দার– এরা তো গুণ্ডা। সিকান্দার আমার মতো একজন বিবাহিত মহিলাকেও মোটর সাইকেলে লিফ্‌ট দিতে চায়, খেয়ানৌকা থেকে নামার সময় আচম্‌কা নৌকায় দোল দিয়ে কাদায় ফেলে মজা দেখতে চায়। সে দশটা অসামাজিক বদমাইশের মধ্যে একটা। কিন্তু সে শুধু তো মুসলমান বলেই নয়।'' [৪২]

অর্থাৎ ধর্ম নয়, মানুষের চরিত্রই তার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে। যে সৎ সে যেমন যে কোন ধর্মাবলম্বী হতে পারে, তেমনি যে অসৎ সেও যে কোন ধর্মেরই হতে পারে। কামাল তার ভুল বুঝতে পারে। সে উপলব্ধি করতে পারে–

"অন্ধকার খাদটা যে কত নীচ পর্যন্ত গিয়েছে, কেউ তা জানে না। তা যে কত নীচ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারে, তাও কেউ জানে না।'' [৪৩]

'আধার মহিষ' উপন্যাসটিতে আরও নানান স্তর রয়েছে, নানান ঘটনা রয়েছে, রয়েছে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র যাদের এক- একজনকে নিয়ে এক একটা চমৎকার রাজনৈতিক পাঠ গড়ে ওঠতে পারে।

আলোচিত উপন্যাস তিনটিতেই ঘটনাপ্রবাহকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করেছে রাজনৈতিক সমাজের বাস্তব। স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের বামপন্থী গোষ্ঠী রাশিয়ার ভিন্ন রকমের রাষ্ট্র প্রনালীর আদলে শ্রেণিহীন, শোষনমুক্ত সমাজ গড়বার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। মন্বন্তর পেরিয়ে, তেভাগার লড়াইতে কৃষকদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ দেখে স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্ভব এই প্রত্যাশাও জেগেছিল। এই প্রত্যাশায়ই 'ছায়ার পাখি'র গোপাল মজুমদারের মত নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে 'পেশাদার বিপ্লবী' জীবন বরণ করে, পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়। বি.টি রণদিভের লাইন কমিউনিস্ট পার্টিকে সাময়িক অপ্রিয় করে তুললেও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, খাদ্য আন্দোলন, বর্গারেকর্ডের দাবিতে আন্দোলন ইত্যাদি বামপন্থী শিবিরে নতুন নতুন মানুষকে নিয়ে এসেছিল। এই গণসামর্থ্যের ভিত্তি কিন্তু সর্বদাই মতাদর্শগত দৃঢ়তা ও গভীরতা ছিল না। বরং ছিল একটা উদার বিশ্বদৃষ্টি, সমতা, গরিবের ভালো হওয়া ইত্যাদি ধারণা সম্পর্কে খানিকটা স্পর্শকাতরতা। মতাদর্শের শিক্ষা কমিউনিস্ট দের দৃঢ় করে। এই ক্ষেত্রকে নড়বড়ে হলেই পদে পদে আপস হয়, পা ফসকানোর প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। কার্যত তাই হয়েছে। 'ছায়ার পাখি'র গোপাল মজুমদার এরা নতুন কমরেডদের কাছে আমল পায় না। সত্তর - আশির দশকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত পরিসরে বামপন্থা তো প্রায় স্ট্যাটাস সিম্বলে পর্যবসিত হয়েছিল। একটু চাপ পড়লেই গর্ভে জমে থাকা লোভ ও স্বার্থ অনাবৃত হয়ে পড়ে শখের পার্টিনেতা আর কর্মীদের। ঘটনা এই যে এসব শখের নেতারা গোপাল মজুমদারের মতো আর্দশবাদীদের শুধু এককোণে ঠেলে দেয় নি, নির্বাচনী রাজনীতির পার্টিগণিতের কাছে তাদের সংবেদনশীলতাও অবান্তর বিবেচিত হয়। তাই নরেন মালোর মতো সৎ কর্মীর নৃশংস খুনের প্রতিক্রিয়ায় বেদনা কম, পার্টির কতটা ক্ষতি হল প্রান্তিক বর্গের এক শিক্ষিত কমরেড মৃত্যুতে, তার বিশ্লেষণ কম, বরং নেতাদের তাড়া করে নরেনের অবর্তমানে আগামী নির্বাচনে আসন ধরে রাখার অঙ্ক। নিষ্ঠাহীন এই রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতাকে অনাবৃত করে অভিজিৎ সেনের বয়ান। অভিজিৎ এও

দেখাতে ভোলেন না, কংগ্রেস দলের মধ্যে বিমলের মর্যাদা আর ক্ষমতা বেড়ে যায় সে খুনের অভিযোগে আভিযুক্ত হবার পর। বস্তুত কম বেশি সকল বুর্জোয়া দলেই, আজকের ভারতবর্ষে একই অবস্থা। হিন্দি বলয়ে 'বাহুবলী'দের যে প্রতাপ, তা হালের পশ্চিমবাংলায়ও লক্ষ করা যাচ্ছে। একদিকে গোপাল মজুমদারের মতো মানবদরদী, সত্যিকারের রাজনৈতিক কর্মী, অন্যদিকে নিখিলেশ্বর - বশিষ্ট - বিমলদের দলের চিন্তু ও কর্ম - রাজনৈতিক সময়ের/সমাজের এই দুই মুখ। প্রথমটি প্রত্যাখ্যাত, দ্বিতীয় গোত্রের প্রাবল্য। ফলে বাম - ডান যে কোনো শাসনেই, সরকার - প্রশাসন - পার্টিসমষ্ঠিতে এক বিশাল মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি তৈরি হয়েছে, যাদের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংস্কৃতির 'বাই প্রোডাক্ট' বলা চলে। এদের চাপে যতীন উন্মাদ হয়, আড়বেঁকির প্রান্তিক মানুষ যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকে।

১২। এই রাজনৈতিক বাস্তবের চিহ্নমালা 'অন্ধকারের নদী'। পঞ্চায়েত এর মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং তৃণমূল স্তরে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটাই সার্থক হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিবেদনে এই বাস্তব স্বীকৃত। আবার গ্রামীণ রাজনীতি মানুষকে নতুন করে অসৎ ও বানিয়ে তুলছে। ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে, ক্ষমতাকে ধরে রাখতে যত ধরনের অনাচার সম্ভব - ডান বাম নির্বিশেষে সকলেই করে থাকে। কোনো সৎ অফিসার যদি যথার্থ পথে গ্রামোন্নয়নের বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করতে চায়, অন্যায় আর পুকুরচুরি রুখতে চায়, তবে তাকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে যেতে হয়। সত্তর দশকের শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করে পরবর্তী দশকগুলির রাজনীতি। গান্ধী-নেহেরু কিংবা মার্কস-লেনিন- হরেকৃষ্ণ কোঙার দেয়ালে ঝোলানো ছবি হয়ে থাকেন কেবল, চেতনার গভীরে তাঁদের জীবন ও কর্ম নতুনকালের রাজনীতির কাছে আর কোনো তাৎপর্যই নিয়ে আসে না।

১৩। একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ হয়ে আত্মস্বার্থ চরিতার্থকরণ, স্বজনপোষণ আর আত্মসাতের ক্ষমতার রাজনীতিতে নতুন পালক হিসেবে যুক্ত হয় - সাম্প্রদায়িকতা।

হটপূজার হুজুগে ভেসে যায় গণতান্ত্রিক, যুক্তবাদী মনও। 'আঁধার মহিষ' উপন্যাসে দেখি, বামপন্থীদের মনেও কোথাও বপন হয় সাম্প্রদায়িকতার বিষবীজানু। ধর্মাচারের ব্যবধানকে ক্ষমতা রাজনীতির লাভালাভের হিসাবে জ্ঞানত অথবা অসাবধানে ব্যবহার করেন সকল পক্ষই। 'ভাবের ঘরে চুরি'র এই বাস্তবতাই ছোট ছোট অনুপুঙ্খের সজ্জায় বা detailing -এ উন্মোচিত করেন লেখক। সচেতন লেখক তিনটি উপন্যাসের ইনার সারফেসে রেখে দেন নিজের সমালোচনা। উপন্যাসের নামগুলি ক্ষয়িষ্ণু, হতাশকর রাজনৈতিক সময়েরই ইশারা যেন। পাখির সামনে আর উপরে যে দিগন্তবিস্তারী আকাশ, তাতেও যেন হতাশার ছায়া। যে আলোর সন্ধানে গোপাল মজুমদারের মতো স্বপ্নদেখা পাখিরা 'এখনি, অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা' বলে বেরিয়ে থাকে, পথ পরিক্রমার শেষে আর থাকে না সে উৎসাহ, কেননা আলো নেই, আছে শুধু ছায়া অথবা স্বপ্নের গন্ধ ডানায় মেখে যে দেশানুরাগী প্রজন্ম আলোর খোঁজে 'অজাগর গরজে' উচ্ছ্বল জনসাগরে নেমেছিল, আজ সবাই ডানা গুটিয়ে নিরাপদ ছায়ায়, শান্তির আশ্রয়ে। এ যেন 'retreat' এর পশ্চাদপসারণের গল্প। এই ছায়াই নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে দেয় সংগ্রামী– সৎ গ্রামাসমাজকে। ক্ষমতার রাজনীতি সৎ মানুষকেও পাঁকে মাখামাখি করে। জনতার জাগ্রত চেতনা, শ্রেণিহীন ব্যবস্থার স্বপ্নকথা এক অন্ধকারের নদীতে হারিয়ে যায়। এই তমিস্রার সঙ্গে বিকল চিন্তায় রূপক হয়ে আসে মহিষ এর ছবি (আঁধার মহিষ)। মহিষ এক বোধবুদ্ধিহীন অলস প্রাণী, ঘোলা জলে চিন্তাহীন ডুবে থাকাই তার প্রধান কাজ। মহিষের মতো বোধবুদ্ধিহীন স্থানু হয়ে পড়ে সজীব মন, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রবল প্রচারে। আখ্যানের নামগুলিই রাজনৈতিক সময়ের এক প্রতিবাদী সন্দর্ভের ইশারা। এই অর্থেই, আলোচ্য তিনটি উপন্যাসকে রাজনৈতিক সময়ে এক বৃত্তহীন প্রতিবেদনের তিনটি অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা চলে। তিনটি উপন্যাস মিলেই অভিজিৎ এর 'রাজনৈতিক সময়ের আখ্যান' নির্মিতি।

*****

উল্লেখপঞ্জি –

১। Irving Howe : Politics and the Novel, 1959
https:/www.questia.com>Library>Politics and Novel

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক ঃ মানিক গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা ১৯৮২, 'সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ- পৃ- ৩৯৮

৩। উদ্বৃত, রইমান, সাঈদউর ঃ ''মার্কস ও মার্কসবাদীদের সাহিত্যচিন্তা'', ঢাকা ১৯৮৫, পৃষ্ঠা- ১৩

৪। সেন অভিজিৎ ঃ বিকাশ শীল সম্পাদিত 'জনপদপ্রয়াস', বইমেলা জানুয়ারি, ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এই সাক্ষাৎকার, পৃষ্ঠা - ১২

৫ আচার্য, অনিল ঃ 'ভূমিকা', 'সত্তর দশক' - প্রথম খণ্ড - অনিল আচার্য সম্পাদিত- পৃষ্ঠা- ৯, ১০

৬। মিশ্র, ভগীরথ ঃ 'তস্কর', কলকাতা ১৯৯২, পৃষ্ঠা - ১৫-১৬

৭। রায়, দেবেশ ঃ 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', কলকাতা ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ৩৯

৮। সেন, অভিজিৎ ঃ 'আমার দুঃখী উপন্যাসের কয়েকটি', কোরক: প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫ বাং, পৃষ্ঠা-১০৩

৯। সেন, অভিজিৎ ঃ 'ছায়ার পাখি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা - ২৪

১০। ঐ, পৃষ্ঠা - ২২,২৩

১১। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৪

১২। ঐ, পৃষ্ঠা - ৩০

১৩। ঐ, পৃষ্ঠা - ৩১

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা - ৩১

১৫। ঐ, পৃষ্ঠা - ৩৯, ৪০

১৬। ঐ, পৃষ্ঠা -৪৭

১৭। ঐ, পৃষ্ঠা -৯১

১৮। ঐ, পৃষ্ঠা -৯১

১৯। ঐ, পৃষ্ঠা -৯৫, ৯৬, ৯৭

২০। ঐ, পৃষ্ঠা - ৯৯

২১। ঐ, পৃষ্ঠা -১৮৬

২২। ঐ, পৃষ্ঠা - ২১৬

২৩। ঐ, পৃষ্ঠা - ২৩৬

২৪। ঐ, পৃষ্ঠা - ২৪০

২৫। হোর, সোমনাথ ঃ উদ্ধৃত, অভিজিৎ সেন এর আমার দুঃখী উপন্যাসের কয়েকটি, কোরক প্রাক্ শারদ সংখ্যা পৃষ্ঠা- ১০৬

২৬। চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন ঃ 'অন্ধকারের নদী ঃ নোনা আর ঘুণের গল্প' জনপদপ্রয়াস, তৃতীয় বর্ষ, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ২০০০, পৃষ্ঠা-৯৪

২৭। সেন অভিজিৎ ঃ 'অন্ধকারের নদী', দশটি উপন্যাস, প্রতিভাস, ২০১২, পৃ- ১৮৪

২৮। ঐ, পৃষ্ঠা -১৮৪

২৯। ঐ, পৃষ্ঠা ১৯২

৩০। ঐ, পৃষ্ঠা - ১৮৯

৩১। ঐ, পৃষ্ঠা - ২০১

৩২। ঐ, পৃষ্ঠা -২০৩

৩৩। ঐ, পৃষ্ঠা১৯২

৩৪। ঐ, পৃষ্ঠা১৯০

৩৫। সেন অভিজিৎ ঃ বিকাশ শীল সম্পাদিত 'জনপদপ্রয়াস', বইমেলা জানুয়ারি, ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এই সাক্ষাৎকার, পৃষ্ঠা - ১১

৩৬। সেন, অভিজিৎ ঃ 'আমার দুঃখী উপন্যাসের কয়েকটি', কোরক: প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫ বাং, পৃষ্ঠা-১০৫

৩৭। সেন অভিজিৎ ঃ বিকাশ শীল সম্পাদিত 'জনপদপ্রয়াস', বইমেলা জানুয়ারি, ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এই সাক্ষাৎকার, পৃষ্ঠা - ১৮,১৯

৩৮। সেন, অভিজিৎ ঃ 'আমার দুঃখী উপন্যাসের কয়েকটি', কোরক: প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫ বাং, পৃষ্ঠা-১০৫

৩৯। সেন, অভিজিৎ ঃ 'আঁধার মহিষ', দশটি উপন্যাস, প্রতিভাস, ২০১২ পৃষ্ঠা - ৩৯১

৪০। ঐ, পৃষ্ঠা - ৩৯৪

৪১। ঐ, পৃষ্ঠা - ৪০১

৪২। ঐ, পৃষ্ঠা - ৪১৩

৪৩। ঐ, পৃষ্ঠা - ৪১৪

*****